জীলান সূর্যের হাতছানি

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

জীলান সূর্যের হাতছানি

হজরত বড়পীর আবদুল কাদের জীলানীর (রহঃ) সংগ্রামী জীবনের ইতিবৃত্ত

¾ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

জীলান সূর্যের হাতছানি
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

গ্রন্থের নাম কবি ফররুখ আহমদের গাওসুল আজম কবিতার প্রথম ছত্র থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক মরহুম কবির রূহানী পদমর্যাদা সমুন্নত করুন। আমিন।

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং
ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০৮ ইং

প্রকাশকঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রচ্ছদঃ আবদুর রোউফ সরকার

মুদ্রণঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ ষাট টাকা মাত্র।

ZILAN SURJER HATH SANI, a life Sketch of Hazrat Abdul Kader Zilanee (Rh.) Written by Mohammad Mamunur Rashid in Bengalee and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange Taka 60/- U.S. $ 10.

ISBN 984-70240-0031-6

দুর্গম বন্ধুর পথে জীলান সূর্যের হাতছানি....
পরিপূর্ণ সেই সূর্য ‘ক্রমাগত ডাকে আর ডাকে...
কাফেলার পথ ছেড়ে যে ফেরে তিমির-দুর্বিপাকে
জীলান সূর্যের রশ্মি তার চোখে দাও আজ আনি।
এ নিরন্ধ্র শর্বরীর অন্ধকারে তীব্র দ্যুতি হানি
তমিস্রা-বিমুক্ত নভে জাগাও নূতন সূর্যোদয়।
বলিষ্ঠ সিংহের মত শক্তিমান, একান্ত নির্ভয়
জীলান সূর্যের রশ্মি যাক আজ খররশ্মি দানি’।

তিমির-পন্থীর দেশে, প্রবৃত্তি-বিজিত মৃত দেশে
এনে দাও সুপ্রবল প্রাণ বহ্নি জীলান সূর্যের,
সত্যের আলোক শিখা এ মৃত কলুষ রাত্রিশেষে
আবার জাগায়ে দাও; দেখে যাও সব আকাশের
সব সমুদ্রের তরে পূর্ণতার অন্তহীন পথ;
প্রতি ধূলি কণিকায় পূর্ণতার প্রচ্ছন্ন পর্বত।

—ফররুখ আহমদ।

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১−১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নকশায়ে নকশ্বন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- নূরে সেরহিন্দ
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

بسم الله الرحمن الرحيم

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং যাবতীয় প্রকারের উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ স. সহ অন্যান্য আম্বিয়া আ., সাহাবা এবং অলি আউলিয়াগণের প্রতি। আমিন।

জ্ঞান আলো। অজ্ঞতা অন্ধকার। জ্ঞানের অভাবই মানবজীবনে আনে অনাচার, অবিচার ও ধ্বংস। মহানবী স. এর আদর্শে তাই জ্ঞান আহরণ করা অবশ্য কর্তব্যকর্ম। তিনি আজীবন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে গিয়েছেন মানুষকে শত বাধা নির্যাতন সত্ত্বেও। তাঁর সময়ে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোও ছিলো অজ্ঞ (জাহেল) ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আত্মনিরাপত্তামূলক সংগ্রাম। আক্রমণমূলক নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মানব সমাজের সংশোধন। উৎখাত নয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে গেলে যে জ্ঞান প্রয়োজন, তা দুই রকম– জবানী ও কলবী।

পরবর্তী সময়ে জ্ঞানের ধারা বহন করে এনেছেন মুজতাহিদ ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস এবং অলি আউলিয়াগণ। তাঁরা ছিলেন উপরোক্ত দুই ধরনের জ্ঞানসম্পন্ন। জ্ঞানার্জনের সুবিধার্থে তাঁরা পরবর্তী সময়ে জবানী এলেম শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্রাসা এবং কলবী এলেম শিক্ষার জন্য তরিকা।

হজরত বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী রহ. এর মাধ্যমে কলবী এলেম প্রথম পায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন তরিকা। কাদেরিয়া তরিকা। পরবর্তী কালে আরো অনেক তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. এর মাধ্যমে সমস্ত তরিকা সম্মিলিতভাবে লাভ করে পূর্ণ অবয়ব যা শরীয়তের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। বরং অবিকল শরীয়তই (হকিকতে শরীয়ত)। দেহ ও প্রাণ অবিচ্ছেদ্য– সুরতে শরীয়ত (বাহ্যিক শরীয়ত) এবং হকিকতে শরীয়ত (অভ্যন্তরীণ শরীয়ত) সেরকমই।

যারা বাহ্যিক শরীয়তের শিক্ষাকেই চূড়ান্ত জ্ঞানার্জন বলে মনে করেন, তারা অর্ধপণ্ডিত। আর যারা হকিকতে শরীয়তের নামে বাহ্যিক শরীয়ত পরিত্যাগ করেন, তারা সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্ট। এই দুই দলই অজ্ঞতার ইমাম (নেতা)। তবে দ্বিতীয় দল প্রথম দল অপেক্ষা ভয়ংকর। বরং দ্বীনের প্রকৃত শত্রু তারাই।

পক্ষান্তরে, উভয় প্রকার শরীয়তের এলেম এবং আমল সম্পন্ন ব্যক্তিগণই দ্বীনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতাধারী। এরকম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির স্বল্পতার কারণে আমাদের সমাজে দ্বীন ইসলামের পূর্ণরূপ ফুটে উঠতে পারছে না। ফলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ভেসে যাচ্ছে তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের গলাবাজি আর সংকীর্ণ ধ্যান ধারণার সয়লাবে। এ ছাড়া ধর্মবিরোধী শিবিরের ষড়যন্ত্র তো আছেই।

এই শৃঙ্খলাহীন সমাজ জীবনে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করবার কাজ এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা সেই আহবানই জানাই সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি। আসুন একত্রিত হই। অর্জন করি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা। তারপর নিয়োজিত হই দ্বীন প্রতিষ্ঠার (একামাতে দ্বীনের) মহান সংগ্রামে।

আল্লাহ্‌পাকই মোমেনগণের একমাত্র অভিভাবক। আমরা এগিয়ে চলেছি। চলবো। ইয়া আল্লাহ্! আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

ইশকের অনল নেই। তাই প্রবৃত্তি ও পৃথিবীর শীতার্ত চরাচরে আমরা কাঁপছি। মার খাচ্ছি কাশ্মীরে, বসনিয়ায়, ফিলিস্তিনে। এসব তো করছে বিধর্মীরা। আর দেখুন ইসলামের ছদ্মাবরণে যারা আমাদের এই বাংলাদেশী ভূখণ্ডে মুনাফিকির চাষবাস শুরু করে দিয়েছে– তারা কাদিয়ানি, শিয়া ও মওদুদী। এদের মধ্যে মওদুদীরাই অন্যদের চেয়ে সফল। তারা নবী, রসুল, সাহাবা, আউলিয়া– আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় বান্দাগণের দোষচর্চাকারী মওদুদীকে ইসলামী বিপ্লবের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের রুখবে কে?

ইশকের অনল নিবু নিবু। তাই এই হিমশীতল স্থবিরতা। অন্তরে অন্ধকার নিয়ে কি দ্বীন ধর্ম হয়? কারা জ্বালায় অন্তরে ইশকের আগুন? প্রেমপথে সমর্পিতপ্রাণ কারা? কামেল মোকাম্মেল পীর দরবেশ খুঁজবো কবে? কবে প্রবৃত্তির পরিধি পেরিয়ে মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ-আগুনে জ্বালাবো জমাট গোনাহের মতো কলবের কয়লা। শীতার্ত মানুষ। অন্তর পোড়াও। আল্লাহ্পাকের ইশকের আগুনে জ্বলো। জ্বালাও। ভস্মীভূত করো লোভ, হিংসা, পৃথিবীপ্রীতি। তারপর জ্বলে ওঠো কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে, শিয়াদের বিরুদ্ধে, মওদুদীদের বিরুদ্ধে। খ্রিস্টান, ইহুদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে।

এটাই পথ, প্রথা, পদ্ধতি। প্রেমের। বিপ্লবের। প্রেমিক হতে চাও না। অথচ বিপ্লবী হতে চাও। এটা কোনো শিক্ষা নয়। অশিক্ষা। কুশিক্ষা। শয়তানী শিক্ষা। বেরিয়ে এসো ঐ প্রতারণা থেকে। প্রবৃত্তি পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার। তার প্রতারণায় মজো না। সোপর্দ করো নিজেকে কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদের করপুটে। যুক্ত হও খাঁটি কোনো তরিকার পীর মোর্শেদের সঙ্গে যাঁর রূহানী সংযোগ পীরানে কেরাম পরম্পরায় হজরত রসুলেপাক স. পর্যন্ত অচ্ছেদ্য, অটুট।

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্পাকের কোটি কোটি কৃতজ্ঞতা– তিনি **'জীলান সূর্যের হাতছানি'** বইখানির অষ্টম সংস্করণ দেখালেন। হজরত পীরে দস্তগীর বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর জীবনালোচনা যে সাম্প্রতিক সময়ের জন্য একান্ত জরুরী– দ্বীনপ্রেমিকগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। তাঁর অগণিত অনুসারী এবং অন্যান্য ইমামগণের অসংখ্য শিষ্য প্রশিষ্য আউলিয়া কেরামগণের মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে আল্লাহ্প্রেমিকগণের অন্তহীন কাফেলা। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ এই আউলিয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই পেয়েছেন ইমান ও হেদায়েত। অথচ এই দরবেশের দেশে আউলিয়া বিদ্বেষী মওদুদী সম্প্রদায় ফেৎনা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সুতরাং আউলিয়া কেরামের জীবনালোচনার কাজে আমরা উদ্যোগী হবো না কেনো? কেনো করবোনা ইশকের অনল প্রজ্জ্বলনের আয়োজন।

সকল উৎকৃষ্ঠ দরূদ ও সালাম মহানবী মোহাম্মদ স., তাঁর প্রিয় পরিবার পরিজন, বংশধরগণ, সাহাবা সমাজ ও আউলিয়া কেরামদের প্রতি। আমিন।

সূচনায় ও সমাপ্তিতে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

হে প্রভু
জ্ঞান দাও

বিদায় জীলান। জন্মভূমি জীলান বিদায়।

এবার বৃহত্তর জীবনের ডাক এসেছে। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে এবার। উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তাই জন্মভূমি জীলানের মায়া ছেড়ে দূরে যেতে হবে এখন। বহু দূরে। বাগদাদে।

সেখানে খ্যাতনামা ওলামা ও মাশায়েখগণের বসবাস। তাঁদের নিকট থেকে হাছেল করতে হবে দ্বীনের এলেম। যে এলেমের সমতুল্য সম্পদ আর কিছু নেই পৃথিবীতে। শেষ নবী স. বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গিয়েছেন সেই শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, এলেম।

সেই রসূলের স. রক্তধারা তাঁর শিরায় শিরায় প্রবহমান। দুনিয়ার আসক্তি কি তাঁকে মানায়? গতানুগতিক জীবনযাত্রায় লিপ্ত হওয়া কি তাঁর জন্য শোভনীয়? তিনি তো অন্য সকলের মতো নন। তিনি যে অসাধারণ। অনন্যসাধারণ।

বালক আবদুল কাদের র. মনস্থির করলেন, বাগদাদ যাবেন তিনি। পিতা জীবিত নেই। অনেক আগেই অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন তাঁর পুণ্যাত্মা পিতা। তাই বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন আবুদল কাদের।

মা অনুমতি দিলেন। ঐ অতটুকু বালক। বুক খালি করে চলে যাবে। মায়ের মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় নেই। ছেলেকে বাগদাদ পাঠাতেই হবে। আরাম আয়েসের জীন্দেগীতো তাঁর জন্য নয়। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে সৃষ্টি করেছেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। আবদুল কাদের তাঁর সন্তান হলে কি হবে। সে যে জন্ম থেকেই আল্লাহ্‌পাকের অলি। আল্লাহ্‌র পথে তো তাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

পথের সামান প্রয়োজন। জমানো সম্পদ তেমন নেই। যা ছিলো সব আবদুল কাদেরের সামনে হাজির করলেন বৃদ্ধা মাতা। মোটমাট আশিটি দীনার। গুণে দেখলেন আবদুল কাদের। চল্লিশটি দীনার সঙ্গে নিলেন। বাকী চল্লিশটি রাখলেন তাঁর ভাইয়ের জন্য।

দূর বিদেশের পথ। এই সামান্য কয়েকটা দীনারে কয়দিনই বা চলবে? কিন্তু তাতে চিন্তারও তো কিছু নেই। আসমান জমিনের যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ্ই তো মোমেনগণের অভিভাবক। মোমেনগণ তো তাঁরই প্রতি নির্ভর করতে অভ্যস্ত। অর্থের প্রতি নয়।

ছেলেমানুষ আবদুল কাদের। কোথায় না কোথায় হারিয়ে ফেলে দীনারগুলো। এই চিন্তা করে মা তাঁর জামার আস্তিনের ভিতরে দীনারগুলো মুড়ে দিয়ে আস্তিন সেলাই করে দিলেন।

বনিকদের এক কাফেলা যাচ্ছে এখান থেকে বাগদাদে। আবদুল কাদের এই কাফেলায় শরীক হয়ে বাগদাদ যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিদায়ের দিন এলো। বিদায়ের বেদনাদায়ক মুহূর্তগুলো ভারী পাথরের মতো বুকে চেপে বসে। বুকের অদৃশ্য অশ্রু সে কঠিন পাথরের বুকে এঁকে যায় শিলালিপি। সে ব্যথার পঙ্‌ক্তিমালা না দেখলেও পড়তে পারে সবাই। সে বেদনার মর্ম তাঁরা ভালোভাবে বুঝতে পারেন, যাঁরা বিদায় দেন তাঁদের প্রিয়জনকে। এ বেদনার বর্ণনা নেই। এ ব্যথার বিবরণ হয় না।

বৃদ্ধা মাতা আবদুল কাদেরের সঙ্গে গৃহের বাইরে বেরিয়ে এলেন। নছিহত করলেন পুত্রকে, 'সব সময় সত্য কথা বলবে। কোনো মুহূর্তের জন্য মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিও না বাবা।' তারপর দোয়া করলেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, 'আল্লাহ্‌পাক তোমাকে হেফাজত করুন।' মায়ের দোয়া। অনায়াসে, বিনা বাধায় পৌঁছে যায় আরশে।

শেষ বারের মতো মা দেখলেন তাঁর ছেলেকে। যেভাবে পৃথিবীর প্রত্যেক মা তার ছেলেকে বিদেশ বিভূঁইয়ে পাঠাবার সময় দেখে। চোখ বেয়ে তাঁর নেমে এলো তপ্ত অশ্রুর প্রবাহ। যেভাবে অশ্রু ঝরায় সন্তান বিচ্ছেদের সময় পৃথিবীর প্রতিটি জননী।

বিদায়ের ব্যথা বুকে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালেন আবদুল কাদের। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে শরীক হলেন বাগদাদগামী সেই বনিকদের কাফেলায়।

কাফেলা এগিয়ে চলে। পিছনে পড়ে থাকে জীলান। শৈশবের কতো শত স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমি জীলান। মায়ের পবিত্র মুখ। অশ্রুসজল চোখ। সবকিছু পড়ে থাকে পিছনে। ধীরে ধীরে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে।

কাফেলা এগিয়ে চলে সম্মুখে।

দিগন্তবিস্তৃত নিসর্গ কতো অপরূপ। উন্মুক্ত আসমানের নীলিমা কোন সুদূরে শেষ হয়েছে কে জানে? কখনো পাহাড়ী পথ। ককনো সমতল সুবিস্তৃত শষ্যভূমি। যে দিকে দৃষ্টি যায় সে দিকেই আল্লাহপাকের কতো সহস্র নিখুঁত নিশানা।

কাফেলা এগিয়ে চলে। চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে থামে। বিশ্রাম নেয়। বিশ্রাম শেষে আবার এগিয়ে চলে কাফেলা। অনেক দূরের পথ। বাগদাদ এখনো অনেক দূর। জীলান থেকে প্রায় চারশ' মাইল দূরত্ব বাগদাদের।

হামাদান অতিক্রম করলো কাফেলা।

এস্থান বিপদসংকুল। লুণ্ঠনকারী দুর্ধর্ষ দস্যুদের আনাগোনা এস্থানে বেশী। যে কোনো মুহূর্তে হামলা করতে পারে দস্যুদল। সন্তর্পণে দ্রুত পথ পাড়ি দেয় কাফেলা।

হঠাৎ ষাটজন দস্যুর এক বিরাট দল আক্রমণ করে বসলো অতর্কিতে। বনিকদল আতংকিত হয়ে পড়লেন। প্রতিরোধ করবার উপায় নেই। কাজাকিস্তানের দস্যু এরা। দুর্ধর্ষ। নিষ্ঠুর। সশস্ত্র।

দস্যুদল নির্বিবাদে কাফেলার সমস্ত মালামাল লুঠ করলো। বালক আবদুর কাদের একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন ডাকাত প্রশ্ন করলো তাঁকে, 'কি আছে তোমার কাছে?'

আবদুল কাদের উত্তর দিলেন, 'চল্লিশটি স্বর্ণ মুদ্রা।'

বালকের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ডাকাতটি চলে গেলো।

একটু পরে এলো আর একজন ডাকাত। সেও প্রশ্ন করলো, 'তোমার কাছে কি আছে বলো।'

'চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা।'– জবাব দিলেন আবদুল কাদের পূর্বের মতো। কিন্তু এ ডাকাতটিও তাঁর কথায় আমল দিলো না। সেও চলে গেলো একদিকে।

কিছুক্ষণ পর অন্য একজন ডাকাত এসে আবদুল কাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'সর্দারজী ডাকছেন তোমাকে। চলো আমার সঙ্গে।'

ডাকাতটির সঙ্গে তাদের সর্দারের সামনে হাজির হলেন আবুদল কাদের। সর্দার অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় বললো, 'ঠিক করে বলো হে ছোকরা। কি আছে তোমার কাছে?

'চল্লিশটি সোনার দীনার।' পূর্বের মতোই জবাব দিলেন তিনি।

সর্দার প্রশ্ন করলো, 'কোথায় রেখেছো দীনারগুলো?'

আবদুল কাদের বললেন, 'আমার জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করা আছে।'

সর্দারের হুকুম মতো আস্তিনের অভ্যন্তর থেকে ডাকতেরা বের করলো মুদ্রাগুলো।

অবাক হয়ে গেলো ডাকাত সর্দার। প্রশ্ন করলো সবিস্ময়ে, 'কেনো তুমি বললে একথা? তুমি না বললেই তো দীনারগুলোর সন্ধান আমরা পেতাম না।'

আবদুর কাদের বললেন, 'মা আমাকে আসবার সময় নসিহত করেছেন, আমি যেনো কখনো মিথ্যা না বলি।'

এ সামান্য কথায় কি হলো কে জানে। ডাকাত সর্দার অনুভব করলো, কথাগুলো ধারালো তলোয়ারের মতো তার কলিজাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। সারা অন্তর জুড়ে তার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো অনুতাপের আগুন। সে আগুনে তার পাষাণ অন্তর গলে গলে তরল হয়ে যাচ্ছে যেনো। অনুতাপের সে তপ্ত প্রবাহ দু'চোখ বেয়ে পড়তে লাগলো ডাকাত সর্দারের।

কাঁদতে কাঁদতে সর্দার বার বার বলতে লাগলো, 'তুমি তোমার মায়ের একটি মাত্র নসিহত মানবার জন্য কতো সতর্ক। আর আমি। আমিতো দিনের পর দিন বছরের পর বছর ভঙ্গ করে চলেছি মহান প্রতিপালকের নসিহত।'

এরপর কাঁদতে কাঁদতেই ডাকাত সর্দার অনুনয় জানালো আবুদল কাদেরের নিকট, 'আমাকে তওবা পড়িয়ে দিন। আমি ডাকাতি করবো না আর। আমাকে তওবা পড়িয়ে দিন।'

হজরত আবুদল কাদের ডাকাত সর্দারকে তওবা পড়িয়ে দিলেন। সর্দারের দেখাদেখি দলের সমস্ত ডাকাতই একে একে তওবা করলো হজরতের কাছে। তারপর লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী সব বনিকদলকে ফিরিয়ে দিলো তারা। ব্যাপার দেখে বিস্ময়ের অবধি রইলো না বনিকদলের।

ঐ অতটুকু এক বালকের জন্য বনিকদল ফিরে পেলো তাদের মালমাত্তা। ডাকাতদলও ফিরে পেলো অমূল্য সম্পদের চিরন্তন খনি। সত্যের নির্ভুল ঠিকানা। প্রমাণিত হলো সত্যই বিজয়ী সর্বকালে। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে যেনো বার বার নিঃশব্দে ঝংকৃত হতে থাকলো আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র বাণী, 'সত্য এসেছে। মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকে।'

সেই নিঃশব্দ আওয়াজের অনুরণনে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো কৃতজ্ঞচিত্ত বনিক এবং তওবাকারী ডাকাতদলের সকলের অন্তর-বাহির। সেই নূরানী মাহফিলের সাক্ষী হয়ে থাকলেন আজন্ম অলিআল্লাহ্ হজরত আবুদল কাদের জীলানী রহ.। কালের পাতায় অংকিত হয়ে থাকলো তাঁর সত্যের এই শাশ্বত স্বাক্ষর। চিরদিনের জন্য। চিরকালের জন্য।

আবু ছালেহ মুসা জঙ্গী দোস্ত রহ. তখন যুবক। তবুও অন্যদের মতো দুনিয়ার চপল সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে না কখনো। অন্তরে ইমানের চিরপ্রবহমান জ্যোতিধারা। আল্লাহ্প্রেমের পবিত্র প্রস্রবণ। শিরায় শিরায় তাঁর বয়ে যায় রসূলের স. রক্তধারা। আখেরী নবী স. এর দশম উত্তর পুরুষ তিনি।

তিনি ভালোভাবেই জানেন পূর্ব পুরুষদের সবার নাম। তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ ইয়াহিয়া জাহিদ। প্রপিতামহ ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ। তাঁর পূর্বের পুরুষগণ ছিলেন সৈয়দ দাউদ, তার পিতা সৈয়দ মুছা ছানি, তার পিতা সৈয়দ আবদুল্লাহ্ ছানি, তাঁর পিতা সৈয়দ মুছা আল জউন, তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মহজ, তাঁর পিতা সৈয়দ হাছান আল মুছান্না। সৈয়দ হাছান আল মুছান্না ছিলেন ইমাম হাছান রা. এর পুত্র এবং ইমাম হাছান রা. এর মাতা পিতা ছিলেন নবী নন্দিনী হজরত ফাতেমা জোহরা রা. এবং আমিরুল মোমেনীন হজরত আলী রা.।

আবু ছালেহ মুসার পূর্বপুরুষদের একজন সেই কবে এসে বসতি করেছিলেন এই জীলানে। তখন থেকে এই পরিবারের সবাই জীলানের অধিবাসী। এই জীলানেই বেড়ে উঠেছেন আবু ছালেহ। শৈশব থেকেই তিনি পেয়েছেন স্বতন্ত্র স্বভাব। অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আবু ছালেহ তখন যুবক। একদিন নদীর ধারে বসেছিলেন তিনি। আনমনে দেখছিলেন নদীর প্রশান্ত প্রবাহ। মানুষের জীবনের মতোই নদীর প্রবাহ যেনো। নীরবে বয়ে যায় সময়ের স্রোত। শেষ হয় পরমায়ু।

হঠাৎ আবু ছালেহ দেখলেন, একটা আপেল ভেসে যাচ্ছে পানিতে। কি জানি কি মনে হলো তাঁর। উঠে গিয়ে ধরে ফেললেন আপেলটি। তারপর খেয়ে ফেললেন পুরো ফলটা। তখন কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন, এই ক্ষুদ্র আপেলের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা?

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বার বার আপেল ভক্ষণের কথা মনে পড়ছিলো তাঁর। তাইতো। কোথা থেকে কার বাগান থেকে ভেসে এসেছে এই আপেল? আপেলের মালিকের বিনা অনুমতিতে আপেলটি খাওয়া কি তার ঠিক হয়েছে? আপেলটিতো তিনি খরিদ করেননি।

বার বার চিন্তা করতে থাকেন আবু ছালেহ। নাহ্। কাজটা ভারী অন্যায় হয়েছে। কাল সকালেই অনুসন্ধান করে জেনে নিতে হবে। কার বাগানের আপেল। কেমন করে ভেসে এলো নদী দিয়ে।

পরদিন সকালে উঠেই তিনি নদীর ধার দিয়ে নদীর উজানের দিকে পথ চলতে শুরু করলেন। কয়েকদিন ক্রমাগত পথ চললেন এভাবে। শেষে এক জায়গায় এসে দেখতে পেলেন– নদীর ধার ঘেঁষে একটা সুন্দর আপেলের বাগান। আবু ছালেহ ধরে নিলেন এই বাগানেরই আপেল খেয়ে ফেলেছেন তিনি। তিনি মনে মনে শোকর আদায় করলেন আল্লাহ্পাকের।

বাগানে ঢুকেই একজন লোককে দেখতে পেলেন আবু ছালেহ। লোকটি বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত। পরিচয় নিয়ে জানলেন, বাগানের মালী সে। তার নিকটই সমস্ত ব্যাপার খুলে বলে আপেলের মূল্য পরিশোধ করতে চাইলেন তিনি।

বাগানের মালীতো অবাক। বলে কি যুবক। নদীতে ভেসে যাওয়া একটা আপেলের জন্য এই যুবক এতদূর ছুটে এসেছে। মালী তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলো– এ যুবক তো সাধারণ যুবক নয়। মালী তাঁকে খুব আদর যত্ন করে বসালো। তারপর তাঁর পথযাত্রার ক্লান্তি দূর হলে খবরটি সে পৌঁছে দিলো বাগানের মালিকের নিকট।

বাগানের মালিক আবদুল্লাহ্ ছওমেয়ী আল জাহিদ র.। তিনি সৈয়দ বংশীয় এক বুজর্গ ব্যক্তি। সংবাদ পেয়ে তিনি বাগানে এসে যুবককে দেখেই বুঝতে পারলেন, এই যুবক সাধারণ যুবক নয়। আলাপ করে যখন জানলেন, যুবকটি শুধুমাত্র একটি আপেলের মূল্য পরিশোধ করবার জন্য এতদূর ছুটে এসেছে, তখন বিস্মিত হলেন তিনি। এই যুবকের অন্তরে কি সাংঘাতিক আল্লাহ্ভীতি। একেতো কাছছাড়া করা যায় না। এইরূপ অমূল্য মানিক কোথায় আর পাওয়া যাবে?

হজরত আবদুল্লাহ্ ছওমেয়ী র. বললেন, 'আপেলের তো অনেক মূল্য। তুমি কি এনেছো?'

আবু ছালেহ্ বললেন, 'আমার কাছে কোনো টাকা পয়সাতো নেই।'

'তবে কিভাবে মূল্য পরিশোধ করবে?'

'গায়ে খেটে দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে চাই। আপনি যতোদিন খুশী আমাকে খাটিয়ে নিতে পারেন।'

হজরত ছওমেয়ী বললেন, 'ওয়াদা করবার আগে ভালো করে ভেবে দেখো।'

আবু ছালেহ বললেন, 'আমি ওয়াদা পালন করবো ইনশা আল্লাহ্।'

হজরত ছওমেয়ী তখন জানালেন, 'পুরো এক বছর আমার বাগানের দেখাশোনার কাজ করতে হবে তোমাকে। এছাড়া আমি যখন যে কাজের হুকুম করবো, তাই করতে হবে।'

আবু ছালেহ এই শর্তে সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। তবু ভালো। আখেরাতে আল্লাহ্‌পাকের সামনে জবাবদিহি করবার চেয়ে দুনিয়ার জীবনে এক বছর পরিশ্রম করা অনেক সহজ কাজ। এ জীবন তো ক্ষণস্থায়ী। আর আখেরাতের জীবন অনন্ত।

আবু ছালেহ বাগান দেখা শোনার কাজে লেগে গেলেন। মালিকের হুকুম মতো অন্যান্য কাজও করতে লাগলেন সেই সঙ্গে।

নদীর ধার ঘেঁষে বাগান। নদীর স্রোতের মতোই সময় বয়ে যায়। দিন, সপ্তাহ, মাস- এভাবেই একদিন শেষ হয়ে এলো বছর। তবুও মালিকের মুখে তাকে ছুটি দেবার নাম নেই। বিনা অনুমতিতে তিনি যাবেনই বা কেমন করে। ভাবেন আবুদ ছালেহ্ ।

এমনি সময় একদিন হজরত ছওমেয়ী তাঁকে ডেকে বললেন, 'দেখো। তুমি আপেলের মূল্য পরিশোধ করেছো অনেক বেশী। সুতরাং আমিও তোমাকে বাড়তি কিছু দিতে চাই। যাতে তুমি কিছু নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে পারো।'

আবু ছালেহ্ বললেন, 'সে আপনার মেহেরবানি। তবে আপনি বুজর্গ ব্যক্তি। আপনার সহবতে আমি রূহানী উপকার পেয়েছি অনেক। সে কারণে আমি চিরঋণী এবং চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।'

হজরত ছওমেয়ী বললেন, আমার একটি কন্যা আছে। কন্যাটি অন্ধ, বধির, খঞ্জ এবং বোবা। আমি কন্যাটিকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই। তোমার মতামত কি?

আবু ছালেহ কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়েই জবাব দিলেন, 'আমি রাজী আছি।'

বিয়ের পর বাসর ঘরে ঢুকেই তাজ্জব হয়ে গেলেন আবু ছালেহ। তাঁর নব পরিণীতা বধুতো অপরূপা! তিনি অন্ধ বধির বোবা– কিছুই নন। তিনিতো অসামান্য রূপবতী– পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক।

আবু ছালেহ্ ভাবলেন, বুজর্গ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ কতোইনা রহস্যময়। পরদিন হজরত ছওমেয়ী খুলে বললেন সব, 'আমার এই কন্যা কোনোদিনও ঘরের বাইরে যায়নি। বাইরের লোকের দিকে কখনোই চোখ তুলে তাকায়নি সে। মুখে কখনো তার অশালীন শব্দ উচ্চারিত হয়নি। কানেও সে শোনেনি কখনো অশ্লীল বাক্যালাপ। তাই তাকে আমি অন্ধ, বধির, খঞ্জ ও বোবা বলেছিলাম।'

হজরত ছওমেয়ী নবদম্পতিকে প্রাণভরে দোয়া করলেন। তারপর তাঁদেরকে বিদায় দিলেন জীলানের দিকে।

তারপর কেটে গেছে কতোদিন। কতো মাস। কতো বছর। জীলানের জীবনযাত্রায় কতো পরিবর্তন এসেছে। জীবনের কতো পাতা হয়ে গেছে স্মৃতি। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা মিশ্রিত সংসার জীবন। এভাবেই প্রত্যেকে উপস্থিত হয় শেষ সময়ে। তারপর ডাক এলেই যেতে হয় সবাইকে এই দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করে। কেউতো চিরকাল থাকে না এখানে। চিরদিন থাকবার স্থানও নয় দুনিয়া।

যুবক আবু ছালেহ্ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর পবিত্রা স্ত্রীও পা রেখেছেন বয়সের শেষ সীমায়। এমন সময়ই এলো শুভক্ষণ। যে বয়সে সন্তান জন্মাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই– সেই বয়সেই অন্তঃসত্তা হলেন আবু ছলেহ্র স্ত্রী উম্মুল খায়ের ফাতেমা র.। একি অলৌকিক ব্যাপার!

অলৌকিকই বা কেনো? সাধারণ নিয়মেই পরিচালিত হয় মানুষের চিন্তা-চেতনা। কিন্তু আল্লাহ্পাক যা ইচ্ছা করেন তাই-ই হয়। নিয়ম অনিয়ম তো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই-ই নিয়ম। নির্বোধ মানুষ শুধু তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বৃত্তে অলৌকিক ও সাধারণের চিন্তা নিয়ে ঘুরপাক খায়।

উম্মুল খায়েরের গর্ভে আল্লাহ্পাক দিলেন সেই জামানায় সর্বশ্রেষ্ঠ অলি আল্লাহ্। যার প্রতীক্ষায় চেয়ে ছিলো তামাম মখলুক। সারা দুনিয়ায় তখন অস্থায়ী পৃথিবীর ভোগবিলাসের লীলাখেলা। ঐশ্বর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তখন মুসলমান সম্প্রদায় হাবু-ডুবু খাচ্ছে। সারা সাম্রাজ্যে শয়তান প্রতিষ্ঠিত করেছে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। মানুষকে এই অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে কে? কে আবার ফিরিয়ে আনবে দ্বীনে মোহাম্মাদী স. এর হৃত সৌন্দর্য? কুফরি বেদাতের সয়লাবে নিমজ্জমান উম্মতে মোহাম্মদী স.কে কে আবার দেখাবে সিরাত্বল মোস্তাকীমের আলোকিত পথ?

উম্মুল খায়েরের গর্ভে তো তিনিই যার সম্পর্কে বহুদিন থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করে আসছেন বিখ্যাত অলি বুজর্গগণ।

তেত্রিশ বছর পূর্বে ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করেছেন শায়েখ আবু বকর হাররার র.। তিনি বলেছেন, শীঘ্রই ইরাকে একজন বিখ্যাত অলিআল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বলবেন, 'আমার কদম সমস্ত অলিআল্লাহ্গণের স্কন্ধে।'

ইমাম হাছান আছকারী র. ছিলেন একজন খ্যাতনামা বুজর্গ। তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর জায়নামাজখানা একজন দরবেশকে দিয়ে অসিয়ত করলেন তিনি, 'এই জায়নামাজখানা সৈয়দ আবদুল কাদেরের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। হিজরী পঞ্চম শতকের শেষদিকে তিনি আবির্ভূত হবেন। তিনি হবেন সেই জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ অলিআল্লাহ্।'

হজরত ইমাম হাছান আছকারীর অসিয়ত অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে তাঁর জায়নামাজখানি সৈয়দ আবদুল কাদেরের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো।

বিখ্যাত বুজর্গ সাইয়্যেদুত তায়েফা হজরত জুনায়েদ বাগদাদী র.ও হজরত আবদুল কাদেরের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তিনি একদিন মোরাকাবা অবস্থায় হঠাৎ উচ্চারণ করলেন, 'তাঁর কদম আমার ঘাড়ের উপর।' একথার সাথে সাথে তিনি তাঁর ঘাড়ও নত করলেন এমনভাবে যাতে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলেন যে, তিনি কার যেনো পা নিজের ঘাড়ে স্থাপন করবার জন্যই ঘাড় অবনত করেছেন।

পরে হজরত যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন, তখন সবাই এরূপ করবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে জীলানে একজন বিখ্যাত আল্লাহ্র অলি জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর মোবারক নাম হবে সৈয়দ আবদুল কাদের। উপাধী হবে মহিউদ্দিন। তিনি আল্লাহ্র হুকুমে বলবেন, 'সমস্ত অলিগণের গর্দানে আমার কদম।' আজ মোরাকাবার সময় আমি সে কথা জানতে পেরে মনে করেছিলাম, সেই বুজর্গের কদম হয়তো আমারও স্কন্ধে স্থাপিত হবে। তাই আমার মুখ থেকে এরূপ কথা উচ্চারিত হয়েছিলো।'

ইরাকের সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হজরত মনছুর বাত্তাহী র.। তিনি ছিলেন জন্ম থেকেই অলিআল্লাহ্। কাশফ্ এবং কারামতসম্পন্নও ছিলেন তিনি। তিনিও একবার ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই আবদুল

কাদের নামে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বুজর্গের আবির্ভাব ঘটবে। তিনি আবেদগণের মধ্যে হবেন অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি তাঁর জামানায় আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের স. সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হবেন। হে আমার মুরিদবৃন্দ, যদি তোমরা তাঁর জানামায় জীবিত থাকো, তবে অবশ্যই তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করো।'

সেই সময়ের খুবই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আর একজন অলিআল্লাহ্ ছিলেন শায়েখ আবু আহমদ আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন মুছা র.। হজরত আবদুল কাদেরের জন্মের তিন চার বছর আগে তিনিও তাঁর সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনিও বলেছিলেন, 'এমন একজন আল্লাহ্র পেয়ারা বান্দার আবির্ভাব সমাগত, যিনি ঘোষণা করবেন, সমস্ত অলিগণের স্কন্ধদেশে আমার কদম স্থাপিত করা হয়েছে।' সেই বুজর্গের এতো বেশী কারামত প্রকাশিত হবে যে, সারা পৃথিবীর মানুষ তা জানতে পারবে। তিনি হবেন সেই জামানার সমস্ত অলিগণের নেতা।

সিরিয়ার বঞ্জ নামের এক প্রাচীন গ্রামে বসবাস করতেন প্রখ্যাত একজন বুজর্গ। তাঁর মুরিদ ছিলো বেশুমার। শায়েখ বঞ্জী র. নামে তিনি পরিচিত ছিলেন সবার কাছে। লোকেরা একবার তাঁর নিকট জানতে চাইলেন কুতুবুজ্জামান সম্পর্কে। তিনি উত্তরে জানালেন, অতিসত্বর বাগদাদে আবির্ভূত হবেন এক যুবক। সকল অলিদের ঘাড়ের উপর স্থাপিত আমার পা'– এইরূপ কথা উচ্চারিত হবে তাঁর মুখে। তিনি বাদগাদের লোকজনকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন এবং বিতরণ করবেন মহব্বত ও মারেফতের শারাবন তহুরা। ঐ সময় সমস্ত অলিগণই তাঁর অনুগত হবেন এবং তাঁকেই সবাই সর্দার বলে মেনে নিবেন। আমি যদি ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমিও তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করবো এবং তাঁর আনুগত্য সসম্মানে স্বীকার করবো। তাঁর কারামতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও হবে আমার জন্য কল্যাণকর।

বিখ্যাত হাওয়ার গোত্রের বুজর্গ শায়েখ আবু মোহাম্মদ হাওয়ার বাত্তাহী র. ইরাকের যে আট জন বিখ্যাত অলিআল্লাহ্র আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হজরত আবদুল কাদের ছিলেন অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন, 'সৈয়দ আবদুল কাদের পাঁচশত হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। তিনি সেই জামানার অলিগণের সর্দার হবেন।'

এইরূপই হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিগণের আবির্ভাব সংবাদ পূর্ববর্তী জামানার বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মুখে মুখে এভাবেই প্রচারিত হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে প্রথম কাতারের মানুষ হচ্ছেন নবী আ.গণ। তার পরের কাতার অলংকৃত করেছেন অলি আল্লাহ্গণ।

নবী আ.গণও তাঁদের পরবর্তী সময়ের নবীগণের বিষয়ে আগাম সংবাদ দিয়ে থাকেন। তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন অহির মাধ্যমে যা সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত।

অলিআল্লাহ্গণও তাঁদের পরবর্তী সময়ের বিশিষ্ট অলিগণের সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তাঁদের জ্ঞান লাভের মাধ্যমে এলহাম ও কাশফ– যা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ মুক্ত না হলেও অধিকাংশ সময়ই তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে।

বৃদ্ধ পিতা মাতা দিন গোণেন। কবে আসবে সেই সুসন্তান? সেই প্রতিশ্রুত অলিআল্লাহ্। আল্লাহ্পাকের কি হেকমত কে জানে? শেষ সময়ে আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে দিলেন এই অসামান্য পুরস্কার।

পবিত্র রমণী উম্মুল খায়ের ফাতেমা র. এর বয়স ষাটের কোঠায়। এ বয়সে তো গর্ভধারণ প্রায় অসম্ভবই বলতে গেলে। কিন্তু সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখার ঊর্ধ্বে আল্লাহ্পাকের সিদ্ধান্ত। তিনি তো বন্ধ্যা হজরত হাজেরা রা. এর গর্ভে দিয়েছিলেন হজরত ইসমাইল আ.কে। হজরত ইব্রাহিম আ. এরও তখন ছিলো বার্ধক্যকাল।

হজরত আবু ছালেহ একদিন স্বপ্নে দেখলেন, হজরত রসূলেপাক স. তাঁর সাহাবাগণসহ তাঁর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, 'হে আবু ছালেহ্। আল্লাহ্পাক তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করেছেন। সেতো আমারই সন্ত ান। সে হবে আল্লাহ্পাকের প্রিয় বান্দা। অলিআল্লাহ্গণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা হবে অতি উচ্চে।'

অবশেষে প্রতীক্ষিত সময় সমুপস্থিত হলো। আকাশে বাতাসে, নিসর্গের শ্যামলিমায়, পাখির কুজনে, ফুলের পাঁপড়িতে, নদীর মন্দ প্রবাহে যেনো মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো সেই শুভ সংবাদ, যার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন জামানার সমস্ত আল্লাহ্প্রেমিকগণ।

শিশু আবদুল কাদের জন্মগ্রহণ করবার কিছুক্ষণ পরই পশ্চিম আকাশে হেসে উঠলো রমজানের চাঁদ। যেনো আল্লাহ্পাকের এই পবিত্র বান্দাকে সেই আল হেলাল স্বাগত জানোলো পরম শ্রদ্ধাভরে। মনে হয়, সে নীরবে ইশারা করে জানিয়ে দিলো নবজাতককে, 'আমি নয়, তুমিই বেশী সুন্দর।'

পরদিন। পহেলা রমজান। সারাদিন কিন্তু শিশু আবদুল কাদের মায়ের দুধ পান করলেন না এক ফোঁটাও। ক্ষুধায় পিপাসায় কাঁদলেনও না এতোটুকু। দুধ পান করলেন তখন, যখন রোজাদারদের ইফতারের সময় হলো। পুরো রমজান চললো এভাবেই। শিশু আবুদল কাদের পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথেই প্রমাণ রাখলেন যে, তিনি অসাধারণ। অনন্যসাধারণ। জন্ম থেকেই তিনি আল্লাহ্পাকের বন্ধু।

জীবন বয়ে চলে তার নিজস্ব নিয়মে। সুখ দুঃখ তার একই অঙ্গের দুই রূপ যেনো। যেনো একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

পৃথিবীর সব স্থানের মানুষের জীবনের মতো জীলানবাসীদের জীবনও কেটে যায় আনন্দ বেদনায় মানব সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে। সময়ের সাগরে নিয়মিত মিশে যায় দিন মাস বছরের খণ্ড প্রবাহ। জন্মভূমি জীলানে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠেন হজরত সৈয়দ আবদুল কাদের।

হঠাৎ জীলানের জীবনযাত্রায় নেমে আসে বিষাদের বারতা। পরম প্রভুর ডাক এসেছে। কেউ কি আছে এমন পৃথিবীতে– যে অস্বীকার করতে পারে এই ডাক?

হজরত আবু ছালেহ্ প্রস্তুত হলেন পরযাত্রার জন্য। তিনিতো তাঁর জীবন মরণ সমস্ত কিছুই জীবনের শুরু থেকে সঁপে দিয়েছিলেন আল্লাহ্পাকের নিকট। সেই– নদীতে ভেসে যাওয়া আপেল। শুধু একটি মাত্র আপেল মালিকের বিনা অনুমতিতে ভক্ষণ করবার অপরাধবোধ তাঁকে কিরূপ বিচলিত করে তুলেছিলো। কার ভয়ে? সেতো তোমারই ভয়ে প্রভু। তোমার কার্যকলাপ কতো নিখুঁত। কতো রহস্যময়। তুমি তোমার প্রেমিকদের প্রতি কতোইনা মেহেরবান। ঐ এক আপেলের সূত্র ধরে

তুমি দিলে জামানার সর্বাপেক্ষা পবিত্রা স্ত্রী? দিলে অসামান্য অলিআল্লাহ্ পুত্র। লাব্বায়েক। আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। হাজির। প্রভুহে আমি হাজির।

অস্থায়ী এ পৃথিবী ছেড়ে হজরত আবু ছালেহ্ পাড়ি দিলেন ইশকে এলাহীর চিরস্থায়ী জগতে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন।

এতিম হলেন আবুদল কাদের। বৃদ্ধা মা, এক ভাই ও আবদুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সংসারটি হলো বিপর্যস্ত। উপার্জনকারী ছিলেন পিতা। তিনিতো পরপারে। নিরূপায় হয়ে আবদুল কাদেরকে যেতে হলো নানার আশ্রয়ে। সেই বিখ্যাত বুজর্গ হজরত আবদুল্লাহ ছওমেয়ী র. এর আশ্রয়ে।

শুরু হলো তার মকতবে যাতায়াত। দ্বীনের প্রাথমিক এলেম শিক্ষা শুরু করলেন তিনি। তাঁর শিশুমনে কখনো হঠাৎ সাদ জাগে সঙ্গী সাথীদের মতো খেলা ধুলায় মেতে যেতে। কিন্তু খেলাধুলায় লিপ্ত হতে পারেন না তিনি।। তাঁকে অদৃশ্য স্থান হতে গম্ভীর সাবধানবাণী উচ্চারণ করে কে যেনো 'ইলাইয়া মুবারাকুন।' 'এদিকে এসো হে পবিত্র সন্তান।' সেই অদৃশ্য আওয়াজ বালক আবদুল কাদেরের মনে ভীতির উদ্রেক করে। তিনি আর খেলাধুলার দিকে পা বাড়াতে পারেন না। তাঁর বালকসুলভ মনে কি এক ভাবের উদয় হয় যেনো। মনে হয়, তাঁকে তো আল্লাহ্পাক পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পয়দা করেছেন। খেলাধুলায় তো তাঁকে মানায় না।

পিতৃহারা আবদুল কাদেরের জন্য মায়ের স্নেহমমতা প্রবল হয়ে ওঠে আগের চেয়ে অনেক বেশী। আহা! এতিম পিতৃহীন সন্তান তাঁর। একে মানুষ করে গড়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব তো এখন তাঁর একার। তিনি হজরত আবুদল কাদেরের দ্বীনি এলেম শিক্ষার ব্যাপারেই যত্ন নেন বেশী।

অল্পদিনের মধ্যে জীলানের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়ে গেলো। জেগে উঠলো আবদুল কাদেরের অন্তরে দ্বীনের উচ্চতর এলেম শিক্ষার দুর্বার আকর্ষণ। এখানে তো সে সুযোগ নেই। দূরদেশে যেতে হবে। যেতে হবে বাগদাদে। এখান থেকে চারশ' মাইল দূরের শহর বাগদাদ। রাজধানী শহর বাগদাদ।

বাগদাদগামী এক বণিক কাফেলায় শরীক হলেন আবদুল কাদের। জননীর স্নেহের আঁচলের মায়া ছিন্ন করে বৃহত্তর জীবনের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

বিদায় জীলান। জন্মভূমি জীলান বিদায়।

দীর্ঘ পথযাত্রা শেষে বাগদাদ পৌঁছে গেলেন হজরত আবুদল কাদের। পথিমধ্যে আর কোনো বিপদ হয়নি কাফেলার। সেই ডাকাত দলতো লুণ্ঠিত সমস্ত সামগ্রী ফেরত দিয়েছে। নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য তারা তওবা করেছে আবদুল কাদেরের হাতে। তার পরের পথ ছিলো সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। আলহামদুলিল্লাহ্।

বাগদাদ পৌঁছেই হজরত দেখলেন, তিনি কপর্দকশূন্য প্রায়। মায়ের দেওয়া মুদ্রাগুলো প্রায় সবই পথে খরচ হয়ে গিয়েছে। কি করা যায় এখন? পরক্ষণেই সচেতন হলেন তিনি। যে উদ্দেশ্যে তিনি ছেড়ে এসেছেন মায়ের স্নেহচ্ছায়া, জন্মভূমির মায়া– সেই উদ্দেশ্যের কথাই প্রথমে চিন্তা করতে হবে।

হজরত মনস্থির করলেন, প্রথমে ভালোভাবে পুনরায় সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ হেফজ করতে হবে। ওস্তাদ তালাশ করতে লাগলেন তিনি। শায়েখ হাফেজ আবু তালেব বিন ইউছুফ র. এর তত্ত্বাবধানে তিনি কোরআন হেফজ করা শুরু করলেন পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে।

রাজধানী শহর বাগদাদ। সুন্দর শহর বাগদাদ। জনজীবন এখানে প্রাণবন্ত। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী গুণীদের সমাবেশ হয়েছে এখানে। তাঁদের নিরলস জ্ঞান চর্চায়, শিক্ষার্থীদের আনাগোনায় আর বিভিন্ন পেশাজীবী জনতার পদচারণায় ব্যস্ত মুখর হয় প্রতিদিন বাগদাদের অলিগলি। তদুপরি রয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি। কাজী, আমির ওমরাহ, আরো অনেক প্রশাসনিক ব্যক্তিদের বসবাস এই শহরে।

শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে দজলা। দজলা নদীর প্রবাহ বয়ে চলে নিরন্ত র। বাগদাদের বুকের আবিলতা যেনো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যায় দজলা। প্রতিদিনে। প্রতি রাতে। বাগদাদের বুক এভাবেই সাক্ষী হয়ে থাকে সময়ের। ইতিহাসের।

চারশ’ অষ্টআশি হিজরীর এই বাগদাদেই হজরত আবদুল কাদের রচনা করলেন তাঁর সাধনা জীবনের প্রাথমিক পরিকল্পনা। দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা থেকে

মনমস্তিষ্ককে মুক্ত রেখে তিনি একে একে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন ওস্তাদের কাছ থেকে।

অল্পদিনের মধ্যেই কোরআন হেফজ সমাপ্ত হলো। এরপর একে একে তিনি কালাম শাস্ত্র, হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি বিষয়েও বিজ্ঞ ওস্তাদগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। কখনো আহার জোটে। কখনো জোটে না। একবার প্রায় বিশদিন অনাহারে কাটলো তাঁর। একসময় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি চললেন জঙ্গলের দিকে। ফলমূল যদি কিছু অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়। শহর থেকে কিছু দূরে যেখানে প্রাচীন পারস্য রাজাদের বিধ্বস্ত রাজপুরী কালের সাক্ষী হয়ে আছে, সেদিকটায় ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখতে পেলেন, আরও অনেক দরবেশ সেখানে খাদ্য অন্বেষণে লিপ্ত। হজরতের মনে এ দৃশ্য অসহ্য মনে হলো। আহা, দরবেশগণের কি কষ্ট। তাঁদের আহার্য বস্তুতে তিনি আবার ভাগ বসাতে এলেন কেনো? হজরত শহরে ফিরে এলেন আবার।

ফিরবার পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু তবু তাঁকে ভালোভাবে চিনতে পারলেন না তিনি।

শেষে লোকটি নিজেই পরিচয় দিলেন তাঁর। বললেন, আমি জীলান থেকে এসেছি। আসবার সময় আপনার মা আমাকে এই সোনার টুকরাটি আপনার নিকট পোঁছে দিবার জন্য বলেছেন।'

একথা বলেই লোকটি মায়ের পাঠানো সোনার টুকরাটি আবদুল কাদেরের হাতে দিলেন।

অসহায় নিঃসম্বল মা। প্রবাসী পুত্রের চিন্তায় দিন কাটে তাঁর। দূর বিদেশে ছেলে কেমন করে দিন কাটায় কে জানে। সেতো আল্লাহ্‌পাকের পেয়ারা বান্দা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌পাকই তাঁর মদদগার। কিন্তু মায়ের মনতো। প্রবাসী পুত্রের জন্য বুক মুচড়ে ওঠে। খোঁজ নিতে থাকেন তিনি এখানে ওখানে। কে যাবে বাগদাদে? কিছু না কিছু ছেলের জন্য পাঠাতে পারলে তবু মন কিছুটা প্রশান্ত হয়।

হজরত মায়ের পাঠানো স্বর্ণটুকরাটি ভাঙ্গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। তারপর ক্ষুধার্ত দরবেশদের খাদ্য ক্রয়ের জন্য প্রত্যেককে কিছু কিছু টাকা পয়সা দিলেন। নিজের জন্যও রাখলেন সামান্য অর্থ। সেই টাকায় কিছু খাদ্য কিনে নিয়ে আরো অনেক অভাবগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে আহার করলেন তিনি।

হজরতের অটুট সাধনা জীবনে এরকম অন্যাভাবের জন্য মাঝে মাঝে ছেদ পড়তে চাইতো। আবার গায়েবী মদদ আসতো আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে।

বাগদাদের কিছু দরিদ্র তালেবে এলেম অপরের সাহায্য এবং দান খয়রাতের উপর ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফসল কাটার মওসুম এলে তাঁরা গ্রামের দিকে চলে যেতেন এবং নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য ফসল সংগ্রহ করতেন মানুষের নিকট থেকে। এভাবে তাঁদের নিশ্চিন্তে চলে যেতো কিছুদিন। একবার তারা আবদুল কাদেরকেও তাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কি মনে করে আবদুল কাদেরও বেরিয়ে পড়লেন তাদের সাথে।

ছাত্রদল পৌঁছলো এক গ্রামে। গ্রামটির নাম ইয়াকুবী। সে গ্রামে বাস করতেন একজন মোস্তাকী আল্লাহ্‌ভীরু লোক। তাঁর নাম শরীফ ইয়াকুবী। তাঁর সাথে মোলাকাত করলেন আবদুল কাদের। হজরত শরীফ ইয়াকুবী তাঁর সাথে কথা বললেন অনেকক্ষণ। তারপর নসিহত করলেন।

'কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা তালেবে এলেমগণের জন্য অশোভনীয়। তোমারও এরকম করা উচিত নয়।'

শরীফ ইয়াকুবীর এই নসিহত চিরদিনের জন্য রেখাপাত করলো আবদুল কাদেরের হৃদয়ে। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যতো অসুবিধাই হোক আর কখনো কারো নিকট হাত পাতবেন না তিনি। এরপর আজীবন এই প্রতিজ্ঞার উপরেই জীবন অতিবাহিত করেছেন হজরত।

হজরত প্রতিদিন এক মসজিদে বসে পাঠভ্যাস করেন। অন্য কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না মোটেও। তবু মানুষ তো। ক্ষুধা তৃষ্ণা তো মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করবেই।

একবার তাঁর উপবাস চললো উপুর্যপরি কয়েকদিন। এই অবস্থায় তিনি কি মনে করে এক মহল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। একজন লোক এসে একটা ভাঁজ করা কাগজ তাঁর হাতে দিলো। লোকটি সেই কাগজের টুকরাটা একটা খাদ্যের দোকানে দিবার ইঙ্গিত দিলো। কাগজটি নির্দিষ্ট দোকানে দিলে দোকানী হজরতকে কয়েকটি রুটি দিলো। রুটি নিয়ে আবদুল কাদের চলে এলেন মসজিদে। সেখানে বারান্দায় বসে যখন তিনি খেতে শুরু করবেন, তখনই মসজিদের প্রাচীরের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লো হঠাৎ। তিনি দেখতে পেলেন প্রাচীরের পাশে পড়ে রয়েছে একটা ভাঁজ করা কাগজ। উঠে গিয়ে তিনি কাগজটি খুলে পড়তে শুরু করলেন। তাতে লেখা আছে, 'আল্লাহ্‌পাক পূর্ববর্তী কেতাবের মধ্যে এক কেতাবে উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্‌র পথের পথিক, তাদের আবার কামনা বাসনার সঙ্গে সম্পর্ক কি? কামনা বাসনা চরিতার্থ করা তো দুর্বল লোকদের স্বভাব। তারাই আল্লাহ্‌র পথে চলতে গেলে কামনা বাসনার উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।'

কিন্তু এভাবে উপবাসের পর উপবাস আর কয়দিনই বা চলে? এতো কষ্ট কার প্রাণে সয়? তবু দৃঢ়তা হারান না আবদুল কাদের। তিনি যে জন্মগতভাবে

আল্লাহ্‌পাকের অলি। না হলে এতো কষ্টবিপদ মাথায় নিয়ে কোনো তালেবে এলেমের পক্ষে কি সম্ভব তার বিদ্যাশিক্ষা চালিয়ে যাওয়া।?

বেশীর ভাগ সময় তিনি মসজিদে বসে পুস্তকের পাতায় ডুবে যান। নিমজ্জিত হন জ্ঞানের গভীর প্রদেশে। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেলে মাটিতে শুয়ে পড়েন একেবারে। অস্ফুট স্বরে বার বার উচ্চারণ করেন আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র কালাম ‘ইন্না মাআল উসরি ইউসরন ফাইন্না মাআল উসরি ইউসরা’ (নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ– নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ’)।

কিছুক্ষণ এভাবে ছটফট করার পর পুনরায় উঠে বসেন তিনি। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখেন, ক্ষুধার অস্থিরতা কোথায় কোন সুদূরে যেনো উড়ে পালিয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এসেছে অপার্থিব শক্তি।

এমনি করে কেটে যায় শিক্ষা জীবন। কখনো ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেলে দজলার ধারে চলে যান। সেখান থেকে সংগ্রহ করে আনেন গাছের পাতা। শাক সবজী। তারপর সেগুলো কোনোরকম সিদ্ধ করে খেয়ে নিবারণ করেন ক্ষুধার জ্বালা। এভাবে বছরের পর বছর ঘুরে ঘুরে আসে। বর্ষা বাদল, ঝড় ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়ে যায়। পরনে একটি মাত্র পশমি জুব্বা। তাও জীর্ণ শীর্ণ যেখানে আহারই জোটে না নিয়মিত, সেখানে পোশাক মিলবে কেমন করে? মাথার পাগড়ীও শতছিন্ন। খালি পায়েই হাঁটতে হয়। সমতল ভূমিতে– কাঁকর বিছানো পথে– সবখানে।

চারিদিকে হাহাকার। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস বিস্তৃত হয়ে পড়েছে সারা বাগদাদে। ক্ষুধার্ত জনজীবনে ব্যর্থতার হাহুতাস। কে আছে কোথায় সাহায্যকারী? অন্ন চাই। অন্ন চাই।

এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে আবদুল কাদেরের অবস্থা হয়ে উঠলো আরো সঙ্গীন। দজলা নদীর তীরে ছুটে গেলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড়। কোথাও শাক সবজীর কোনো চিহ্ন দেখলে একসঙ্গে ভীড় করে সবাই। আবুদল কাদের এ করুণ দৃশ্য দেখে পুনরায় শহরে ফিরে আসেন। শরীরে শক্তি

নেই এতটুকুও। মনে হয় এই মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন তিনি। এইরূপ সঙ্গীন অবস্থায় পাশের এক মসজিদে আশ্রয় নিলেন তিনি।

একটু পরে মসজিদে ঢুকলো এক যুবক। রুটি ও কিছু ভুনা গোশত নিয়ে মসজিদে ঢুকে এক পাশে বসে খেতে শুরু করে দিলো সে। হজরতের মনে হলো, এই বুঝি ভেঙ্গে যাবে তার ধৈর্য্যের সব বাঁধ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেনো তাঁর মুখবিবর খাদ্র গ্রহণের জন্য প্রসারিত হয়ে যেতে চায়। অনিচ্ছাকৃত এ অবস্থার জন্য তিনি মনে মনে লজ্জিত হলেন খুব।

যুবকটি অবস্থা দেখে বুঝে ফেললো, হজরত খুবই ক্ষুধার্ত। সে তাঁকে খাবারে শরীক হবার জন্য ডাকলো। হজরত ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তিনি নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। খেতে শুরু করলেন সেই যুবকের সঙ্গে।

আহারের শেষে যুবকটি বললো, 'আচ্ছা। কি পরিচয় তোমার বলো দেখি।'

আবদুল কাদের বললেন, 'আমার বাড়ী জীলানে। এখানে আমি এলেম অর্জনের জন্য এসেছি।'

একথা শুনে খুশী হলো যুবকটি। বললো, 'তাই নাকি। আমিওতো জীলানের বাসিন্দা। আচ্ছা তুমি জীলানের আবদুল কাদেরকে চেনো?'

'আমিই আবদুল কাদের।'

হজরতের জবাব শুনে চমকে উঠলো যুবকটি। তারপর সে কেঁদে ফেললো একেবারে। কাঁদতে কাঁদতেই বললো, 'হায়। আমিতো তোমাকেই খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে বেড়াচ্ছি। বাড়ী থেকে রওয়ানা হবার সময় তোমার মা আমাকে তোমার জন্য আটটি দীনার পাঠিয়েছেন। কতো খুঁজলাম তোমাকে কদিন ধরে। পেলাম না। এদিকে আমারও টাকাকড়ি শেষ। তিন দিন ধরে অনাহারের পর নিরুপায় হয়ে আজ তোমার দীনার ভাঙ্গিয়েই আমি এই রুটি ও গোশত কিনে খেতে বসেছিলাম। তুমি যা খেলে তা তোমারই টাকায় কেনা খাদ্য। আমি তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার অর্থ খরচ করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করো তুমি।'

যুবকের কথা শুনে শোকর গোজারী জানালেন আবদুল কাদের আল্লাহ্পাকের দরগায়। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্পাকের মেহেরবানির সীমা পরিসীমা নেই। তিনি অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে তাঁকে হেফাজত করেছেন।

বছরের পর বছর কেটে যায়। হজরত আবদুল কাদের র. একে একে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে তালিম নিতে থাকেন। অর্ধাহার অনাহারে দিন চলে যায়। কিন্তু হজরতের সেদিকে কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। উদ্দেশ্য সাধনের পথে তিনি এগিয়ে চলেন দুঃসাহসী দুর্বার নাবিক সিন্দাবাদের মতো। জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র থেকে সমুদ্রে চলে তাঁর অন্বেষণের পাল তোলা জাহাজ। বিরাম বিশ্রাম নেই। সময় নষ্ট করবার সময়ও যে নেই। সামনে কতো কাজ পড়ে আছে। আল্লাহ্‌পাক যে কাজের জন্য তাঁকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রস্তুতি পর্বের প্রথম পর্যায়ও শেষ হলো না এখনো।

অবশেষে আল্লাহ্‌পাক রহম করলেন তাঁর প্রতি। গায়েবী আওয়াজ হলো আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে, 'তুমি কারো কাছ থেকে ঋণ করে তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করো যাতে ক্ষুধার পেরেশানি তোমার জ্ঞানার্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে।'

হজরত জবাব দিলেন, 'আমিতো সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। ঋণ পরিশোধ করবো কিভাবে?

আবার আওয়াজ হলো, 'তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার।'

আশ্বাসবাণী পেয়ে হজরত গেলেন একজন পরিচিত রুটিওয়ালার কাছে এবং বললেন, 'আপনি যদি প্রতিদিন দেড়খানা রুটি ধার দিতেন তবে আমার খুবই উপকার হতো। শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌পাক যখন আমাকে অর্থ সম্পদ দান করবেন তখন আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করবো। আর ঋণ পরিশোধের আগেই যদি আমি মারা যাই, তবে আপনি আমাকে মাফ করে দিবেন।'

রুটিওয়ালা এই আল্লাহ্‌ভীরু তালেবে এলেমকে অনেকদিন ধরেই জানতেন। হজরতের কথা শুনে কেঁদে ফেললেন তিনি। বললেন, 'আমি রাজি আছি। আপনার যখন যা প্রয়োজন, বিনা দ্বিধায় আপনি আমার দোকান থেকে তাই গ্রহণ করবেন।'

এরপর থেকে আরো গভীরভাবে হজরত জ্ঞানান্বেষণে লিপ্ত হলেন। কিছুদিন কাটলো নির্বিঘ্নে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি। কতোদিন হয়ে গেলো। রুটিওয়ালার কাছে দিন দিন ঋণের বোঝা ভারীই হয়ে যাচ্ছে। অথচ ঋণ পরিশোধের কোনো ব্যবস্থাই নেই তাঁর সামনে।

পেরেশানি চরমে উঠলে আবার শুনতে পেলেন তিনি সেই আওয়াজ। তাঁকে লক্ষ্য করে অদৃশ্য জগৎ থেকে বলা হচ্ছে, 'তুমি অমুক স্থানে যাও। সেখানে অনুসন্ধান করে যা পাও তাই দিয়ে রুটিওয়ালার কর্জ পরিশোধ করো।'

নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থানটিতে যেয়ে তিনি পেলেন একটি সোনার টুকরা। তাই নিয়ে এসে দোকানীর ঋণ পরিশোধ করলেন তিনি।

দেখতে দেখতে কেটে গেলো নয়টি বছর। দজলা নদী দিয়ে এতোদিনে কতো পানি গড়িয়েছে তার হিসেব জানা নেই কারো। প্রকৃতিতে কতোবার এসেছে নতুন নতুন মওসুম। নতুন নতুন রূপে বাগদাদ বদল করেছে কতোবার তার সাজ। নক্ষত্রশোভিত কতো রাত, রৌদ্রে বাদলে ঘেরা কতো দিন এসে এসে ফিরে গিয়েছে অতীতের ঠিকানায়। জ্ঞান অন্বেষণের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় হজরতের জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে দীর্ঘ নয়টি বছর।

হজরত এখন উঠে এসেছেন বিজ্ঞ আলেমগণের কাতারে। এলমে কেরাআত, তাফসীর, হাদিস, আকায়েদ, এলমে কালাম, এলমে ফেরাছাত (মনোবিজ্ঞান), তারিখ (ইতিহাস), এলমে আনছাব (বংশ বিদ্যা), এলমে লোগাত (অভিধান জ্ঞান), আদব (সাহিত্য), এলমে উরুজ (ছন্দ শাস্ত্র), এলমে নহু (ব্যাকরণ বিদ্যা), এলমে মুনাজিরা (তর্ক শাস্ত্র) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি এখন পণ্ডিত।

প্রতিটি বিষয়ের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেছেন সেই বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাঠ। অর্জন করেছেন বুৎপত্তি। কিন্তু জ্ঞানের কি শেষ আছে? এ যে এক অন্তহীন সাম্রাজ্য। এক মঞ্জিল অতিক্রম করতে না করতেই এসে পড়ে আর এক মঞ্জিলের আহবান।

হজরত আবদুল কাদের ভাবেন, কেতাবের জ্ঞানার্জন তো শেষ হয়ে এলো। এবার শুরু করতে হবে কেতাবের মালিকের পরিচিতি জ্ঞানের অনুসন্ধান। জ্ঞানের

বহিরাবরণ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এবার জ্ঞানের অভ্যন্তরভাগের অন্তযাত্রায় শুরু করতে হবে অন্তহীন সফর। নাহলে তো জ্ঞানের সাধনায় থেকে যাবে অসম্পূর্ণতা। আর অসম্পূর্ণতা তো সব সময়ই ক্ষতিকর।

দ্বীন ইসলাম আকমল দ্বীন। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ভিতর বাহির উভয় অংশকেই জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করবার সর্বাঙ্গসুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। তাই প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীগণ এই উভয়প্রকার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই লাভ করেন পূর্ণতা। আর যারা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন, তারাই কেবল কেতাবী এলেম অর্জনের পর অন্তরের এলেম (কলবী এলেম) অর্জনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে অস্বচ্ছ ধারণার শিকার হয়ে থাকেন সারাটি জীবন ধরে। এই ধরনের অপূর্ণ ব্যক্তিগণ নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত, তেমনি অন্যদেরকেও পরিচালিত করেন ক্ষতিকর গন্তব্যের দিকে। কলবী এলেম না শেখার ফলে তাদের কলব (অন্তর) বঞ্চিত থাকে এলমের নূর থেকে। তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরে তাই ঠাঁই নেয় রিয়া, কীনা, সংকীর্ণতা, হিংস্রতার রাশি রাশি আবর্জনা। ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ এলেম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য করে ফেলে বানচাল।

এলেম অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অজ্ঞতার অভিশপ্ত জগত থেকে জ্ঞানের জ্যোতির্ময় জগতের সীমাহীন অভিযাত্রায় নিয়োজিত হওয়া। যে অভিযাত্রার শেষ মঞ্জিল হচ্ছে দীদারে এলাহী। কিন্তু দীদারে এলাহীর উন্মুক্ত আসমানে উড়াল দিতে গেলে তালেবে এলেমের প্রয়োজন দুটি ডানার। পাখি যেমন একটি ডানা দিয়ে উড়তে পারে না, তেমনি তালেবে এলেমেও শুধুমাত্র জবানী এলেম অথবা শুধুমাত্র কলবী এলেমের সাহায্যে প্রবেশ করতে পারে না ইশকে এলাহীর সুবিশাল সাম্রাজ্যে। তাই প্রকৃত আল্লাহ্ প্রেমিকগণ উদ্দেশ্য সাধনে সফলতার জন্য এই দুটি ডানাই প্রস্তুত করেন সর্বাগ্রে।

আখেরী নবী স. তাই এই দুই এলেম সম্পর্কেই বর্ণনা প্রদান করেছেন এভাবে, 'এলেম দুই প্রকার। এক প্রকার এলেম জবানে উচ্চারিত হয়। এই প্রকারের এলেম কেয়ামতের দিনে তার বিরুদ্ধে দলিল হবে। আর এক প্রকার এলেম জমা থাকে কলবে। আর এই এলেমই হচ্ছে উপকারী এলেম।' (মেশকাত)

আখেরী নবী স. এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তাই কলবের তমসার প্রভাবে মানুষ যখন ছিরতাল মোস্তাকিমের আলোকোজ্জ্বল পথ থেকে দূরে সরে পড়বে, তখন তাদেরকে পুনরায় পূর্ণ দ্বীনের প্রতি পথপ্রদর্শনের জন্য উম্মতে মোহাম্মাদীর স. মধ্যে থেকেই অভ্যুদয় ঘটবে জবানী এলেম এবং কলবী এলেমের অধিকারী পূর্ণ আলেম সম্প্রদায়ের। এরাই প্রকৃতপক্ষে ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের উত্তরাধীকারী)। এরাই ওলামায়ে রছেখীন। এরাই বিকৃতির আক্রমণ থেকে, অপূর্ণ ও অসৎ আলেমগণের খপ্পর থেকে এবং মারেফতের দাবীদার

তথাকথিত ভণ্ড সুফী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করে সর্বসমক্ষে বিকশিত করেন দ্বীনের প্রকৃত রূপ।

হজরত আবদুল কাদের তো সেইরূপই উচ্চদৃষ্টিসম্পন্ন তালেবে এলেম, মকছুদ মঞ্জিলে পৌঁছানোর আগে বিশ্রাম গ্রহণ করা যাদের পক্ষে অসম্ভব।

হজরত তাই মনস্থির করলেন, এবার তরিকতের পথে কদম বাড়াতে হবে।

এ পথ প্রকৃত প্রেমিকদের পথ। যাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অলি গলিতে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চারিত হয় 'আরেনি' 'আরেনি' ধ্বনি। এ পথ তাদের পথ। এ পথের শেষ গন্তব্যে পৌঁছতে গেলে মূল্য দিতে হয় অনেক। দিতে হয় সুকঠিন সাধনার সুদীর্ঘ সময়। দিতে হয় প্রতি পদে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে পর্বতের মতো ধৈর্যের পরীক্ষা। সামান্যতম ভুলের কারণে পদস্খলন চিন্তার সন্ত্রস্ততায় কাটাতে হয় প্রতিটি পল। তবুও প্রকৃত প্রেমিকগণ এই পথেই পাড়ি জমাবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

এ পথ যে ইশকে এলাহীর পথ। আশেক ব্যক্তিগণ তো এই পথ ব্যতিরেকে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাতে অক্ষম। বিপদ, কষ্ট যতোই হোকনা কেনো, সবকিছুই অতিক্রম করতে হবে। দলে যেতে হবে পথের বন্ধুরতা, অমসৃণতা, বিপদ সংকুলতা। মাশুক মিলনের পথে কোনো বিপদই বিপদ নয়। কোনো বাধাই বাধা নয়।

কিন্তু এই অদৃশ্য পথের পথিক হতে গেলে রাহবার প্রয়োজন। পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। পীরের প্রয়োজন। মোর্শেদ ব্যতীত এ পথে চলা যায় না।

এই বাগদাদেই তিনি বসবাস করেন। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ পীর বুজর্গগণতো তাঁরই শাগরিদ। হজরতের মোবারক নাম শায়েখ হাম্মাদ বিন মুসলিম দাব্বাছ র.। তাঁরই নিকট তরিকতের তালিম গ্রহণ করবেন বলে হজরত আবদুল কাদের মনস্থির করলেন।

শায়েখ হাম্মাদ বিন মুছলিম দাব্বাছ র. বাস করেন মুজাফফরিয়া মহল্লায়। সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা তাঁর। আঙ্গুর এবং খেজুরের রস বিক্রি করা তাঁর পেশা। তাই মানুষ তাঁকে দাব্বাছ বলে ডাকে। 'দাব্বাছ' শব্দের অর্থ রস বিক্রেতা।

এই অসামান্য বুজুর্গের রসে কোনেদিনই মাছি বসে না। কীট পতঙ্গও বোঝে আল্লাহ্‌র অলিদের মর্যাদা কিরকম। বোঝে না শুধু মানুষ।

সিরিয়ার রাহবা গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। বাগদাদে আসার পর আর কোনোদিন ফিরে যাননি জন্মভূমিতে। বেছে নিয়েছেন তালেবে মওলাগণকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত করবার মহান দায়িত্ব। আল্লাহ্ প্রেমের অত্যুজ্জ্বল এক বিরল নিদর্শন তিনি।

এই বুজুর্গের দরবারে যাতায়াত শুরু করে দিলেন হজরত আবদুল কাদের। তাঁর সহবতের প্রখরতায় যেনো হজরত আবদুল কাদেরের নজরে ভেসে ওঠে মারেফাতের অন্তহীন পথের অদৃশ্য হাতছানি।

শায়েখ প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর মুরিদগণকে, 'আল্লাহ্‌কে পাওয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উপায় হলো মহব্বত। যতোক্ষণ রূহ নফছ থেকে সম্পর্কচ্যুত না হবে ততোক্ষণ আল্লাহ্‌তায়ালার বিশুদ্ধ মহব্বত লাভ হতে পারে না। যতোদিন প্রবৃত্তি প্রবল থাকবে, ততোধিন পর্যন্ত পাওয়া যাবে না প্রকৃত মহব্বতের স্বাদ।'

শায়েখ আরো নসিহত করেন, ' তোমার অন্তর থেকে যখন নফছানি বাসনা বিদূরিত হবে, তখনই হাছেল হবে তওহীদ। যখন তোমার আমলে কোনো গরজ না থাকবে তখনই লাভ হবে ফানা। যদি তিনি তখন তোমাকে আহবান করেন, তবে জবাব দাও। যদি ওয়াদা করেন, তবে তুমি নির্ভর করো। যদি আদেশ করেন, তবে তুমি তা নির্বিবাদে পালন করো। যদি তিনি তোমাকে কোনো কিছু চাইতে বলেন, তখন তুমি বলো, আমিতো বিশ্বাসী। যদি ইবাদত করতে বলেন, তবে এর জন্য তাঁরই নিকট শক্তি প্রার্থনা করো। যদি তওহীদ কামনা করেন তবে বলো, 'আমাকে তোমার পানে আকর্ষণ করো হে পরম প্রভু।' তখন আল্লাহ্‌পাকের সীমাহীন অনুগ্রহে তোমার মারেফত হাছেল হবে। তখন তুমি হবে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। তখন তুমি আর তুমি নও। তুমি তখন আল্লাহ্‌র। তখন তোমার বাক চিন্তা অভিব্যক্তি ও কার্যকলাপ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে সংঘটিত হবে।'

শায়েখ হাম্মাদ র. স্পষ্ট বুঝতে পারেন তাঁর কাফেলার নবাগত সদস্য আবদুল কাদের সাধারণ তালেবে মওলা নন। তিনি অসাধারণ। অনন্যসাধারণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত রয়েছেন আল্লাহ্‌পাকের জ্যোতির্ময় রহমতের বলয়ে। কাল তাঁর জন্য প্রতীক্ষমান। সে সময় সন্নিকটে যখন তিনি হবেন গাউছদের নেতা। গাউছুল আজম । কুতুবদের কুতুব।

একদিন তিনি মজলিশে বলেই ফেললেন একথা। বললেন, 'সেই সময় সমাগত প্রায়, যখন দুনিয়ার সমস্ত অলিআল্লাহ্‌গণের গর্দানে থাকবে তাঁর কদম। এই অনারব ব্যক্তির মুখে এক সময় উচ্চারিত হবে একথা, 'আমার কদম সকল অলিআল্লাহ্‌গণের স্কন্ধে।' তাঁর এই ঘোষণার সময় তখনকার সমস্ত আউলিয়া তাঁর কদমের উদ্দেশ্যে নিজেদের ঘাড় নত করবে।'

কিন্তু সেই সময়ের পূর্বে ভাঙতে হবে অনেক কঠোর সাধনার সিঁড়ি। প্রেমের বিচিত্র গতি প্রকৃতির ঝড়ঝাপটায় নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কতোবার যে অস্তিত্বহীন হয়ে ফিরে পেতে হবে অস্তিত্বের নতুন নতুন নিরীখ, তার ইয়াত্তা নেই।

মহাসাধনার এক পর্যায় শেষ হলো হজরত আবদুল কাদেরের। শায়েখ হাম্মাদের সহবতের পূর্ণ ফায়দা নিয়ে তিনি পূর্ণতার এক বিশেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এখনো সফরের নেশা কাটেনি তাঁর।

দুঃসাহসী নাবিক যেমন এক অশান্ত সমুদ্রের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সফরের সমাপ্তির পর আর এক সমুদ্র পাড়ি দেয়ার নেশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে– আবদুল কাদেরের হলো সেই অবস্থা। তিনি মারেফতের অনন্ত পথে আবার সফর শুরু করলেন। এবারের পাঞ্জেরী শায়েখ আবু ছাইদ মখজুমী র.। বাগদাদের আর এক বিস্ময়কর বুজর্গ।

একবার ক্ষুধায় খুবই কাতর হয়ে পড়লেন আবদুল কাদের। এ অবস্থায় কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন শায়েখ আবু ছাইদ মখজুমী র.। তিনি তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য আহবান জানালেন আবদুল কাদেরকে। তাঁর ডাকে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লেন আবদুল কাদের। কেনো যেনো সহজ হতে পারছিলেন না হজরত। তাঁর এ অবস্থা দেখে শায়েখ মখজুমী ফিরে গেলেন নিজে গৃহে।

একটু পরেই আবদুল কাদেরের নিকট এসে হাজির হলেন হজরত খিজির আ. এবং তাঁকে তাগিদ দিলেন শায়েখ মখজুমীর বাড়ীতে যাবার জন্য। খিজির আ. এর কথায় তিনি শায়েখ মখজুমীর বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেলেন, শায়েখ মখজুমী তাঁর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। বললেন তিনি, 'আমার ডাক কি যথেষ্ট ছিলো না। শেষে খিজির আ.কে ডাকতে হলো।'

এই বলে শায়েখ মখজুমী বাড়ীর ভিতর থেকে খাবার নিয়ে এলেন। তারপর তাঁকে সামনে বসিয়ে নিজ হাতে খাবার খাওয়াতে লাগলেন পরম সোহাগভরে। আবুদল কাদের অনুভব করলেন, প্রতি লোকমার সাথে সাথে যেনো তাঁর অন্তরে প্রবেশ করছে অনন্ত নূরের প্রবাহ।

অবশেষে একদিন এলো সেই সুসময়। দীর্ঘ সাধনার স্বীকৃতি। নিজ পীর ও মোর্শেদের প্রেমময় সমর্থন। কামালতের নির্দশন স্বরূপ বেলায়েতের খেরকা পেলেন আবদুল কাদের।

শায়েখ আবু ছাইদ মখজুমী র. বললেন, 'এ খেরকা সেই খেরকা যা রসূলে আকরাম স. প্রদান করেছিলেন আমিরুল মোমেনীন হজরত আলী রা.কে। পরে তা আমার সিলসিলার পীরানে কেরামের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এসে পৌঁছে আমার কাছে।'

মোবারক খেরকা পরিধান করলেন হজরত আবদুল কাদের। সঙ্গে সঙ্গে তাজাল্লি ও বরকতের অপার্থিব জ্যোতিচ্ছটায় ভরে গেলো তাঁর সমস্ত অবয়ব।

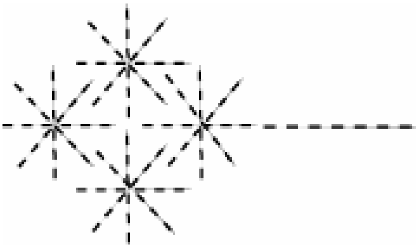

সফলতার সূর্য উঠেছে আকাশে। আবদুল কাদেরের জীবনের আকাশে এখন সফলতা আর সফলতা। আলো আর আলো। তিনি এখন পূর্ণ মানুষ। কামেল ইনসান।

তিনি তো ছিলেন আজন্ম অলিআল্লাহ্। সদ্যজাত শিশু হয়েও তিনি প্রমাণ দিয়েছেন তার। রমজানের শুরুতে জন্ম নিয়েই তিনি রোজা রেখেছেন পূর্ণ একমাস। দিন দিন বেড়ে উঠেছেন সেভাবেই। তাঁর সমস্ত অবয়বে, অভিব্যক্তিতে, স্বভাবে ছিলো বেলায়েতের পবিত্র উজ্জ্বলতা। কিশোর বয়সেই তাঁর সামান্য কথায় তওবা করেছিলো ডাকাতের দুর্ধর্ষ এক দল।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একবার গিয়েছিলেন বায়তুল্লাহ্ শরীফ জেয়ারতে। তখনও তাঁকে কেন্দ্র করে ঘটেছিলো অনেক অলৌকিক ঘটনা। তখনও আল্লাহ্পাক তাঁকে এলহামের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন তাঁর মর্যাদা প্রসঙ্গে।

সেই বায়তুল্লাহ্ শরীফ সফরে তিনি পথ চলতে চলতে যখন মিনারায়ে উম্মে কুরূন পৌঁছলেন তখন এক যুবকের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। যুবকের নাম আদী বিন মুছাফির। যুবক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় রওয়ানা দিয়েছো।'

আবদুল কাদের বললেন, 'মক্কা মোয়াজ্জমা।'

যুবক বললেন, 'আমারও উদ্দেশ্য তাই। তবে কি আমরা একসঙ্গে যাত্রা করতে পারি না?'

আবদুল কাদের জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

দুজনে এক সঙ্গে মক্কাভিমুখে চলতে শুরু করলেন। কিছু পথ অতিক্রম করবার পর বোরখা পরিহিতা একজন হাবশী রমণীর সম্মুখীন হলেন তাঁরা দুজনেই। হাবশী রমণী আবদুল কাদেরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, ' আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

জবাব দিলেন আবদুল কাদের, 'বাগদাদ থেকে।'

'আপনি আজ আমাকে পেরেশান করেছেন।'

হাবশী বমণীর এই কথায় বিস্মিত হলেন আবদুল কাদের। বললেন, 'কেমন করে?'

রমণী বললেন, আমার বাসস্থান হাবশায়। আজ আমি মোশাহেদার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্পাক আপনার অন্তরে এক বিশেষ তাজাল্লি নিক্ষিপ্ত করেছেন এবং আরো দান করেছেন সীমাহীন ফজল ও করম। এই জামানায় এরকম নেয়ামত কারো হাছেল হয় না। সেই জন্য আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি আমি। আমি আজ সারাদিন আপনার সহবতে কাটাবার ইচ্ছা করি এবং রোজা এবং ইফতারও এক সঙ্গে করতে চাই।'

আবদুল কাদের রাজী হলেন এ প্রস্তাবে। তারপর সঙ্গী যুবক, হাবশী রমণী এবং আবদুল কাদের তিনজন এক সাথে পথ চলতে শুরু করলেন। রাস্তার এক পাশ ধরে হাবশী রমণী এবং অপর পাশ ধরে তাঁরা দুজন পথ চলতে লাগলেন।

দিন শেষ হয়ে এলো। ইফতার করতে হবে এবার। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন আকাশ থেকে নেমে এলো একটা খাঞ্চা। তাতে রয়েছে কয়েকখানা রুটি, কিছু সিরকা এবং সামান্য তরকারী।

হাবশী রমণী বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্। তিনি আমার এবং আমার মেহমানদের সম্মান রক্ষা করেছেন। তিনি প্রতিদিন আমাকে রুটি দেন দুইটি আর আজ দিয়েছেন ছয়টি।'

তিনজনের প্রত্যেকে দুটি করে রুটি, সিরকা ও তরকারী দিয়ে ইফতার শেষ করবার পর আসমান থেকে নেমে এলো একটি পানির পাত্র। সেই পাত্র থেকে পানিও পান করলেন তিনজনে। সেকি অপূর্ব আস্বাদ সেই পানির।

ইফতারের পর হাবশী রমণী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর কার্যকলাপ দেখে বিস্মিত হলেন আবদুল কাদের ও যুবকটি। মনে মনে অনেক শ্রদ্ধা জানালেন তাঁকে। তারপর পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন মক্কার দিকে।

মক্কায় পৌঁছে যখন তাঁরা দুজনে একসঙ্গে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন, তখন ঘটলো আর এক বিস্ময়কর ঘটনা। ইশকে এলাহীর মত্ততার কারণে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন যুবকটি। সবাই ধারণা করলো মৃত্যু ঘটেছে তাঁর। হঠাৎ দেখা গেলো সেই হাবশী রমণীকে। আশ্চর্য্য! কোথা থেকে কখন তিনি এখানে এসে পৌঁছলেন। হাবশী রমণী সংজ্ঞাহীন যুবককে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'তিনিই তোমাকে জীবন দান করবেন যিনি তোমার জীবন হরন করেছেন। পবিত্র সেই জাত যাঁর জালাল এবং নূরের তাজাল্লীর সামনে কোনো জড়বস্তুই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না, যদি না তিনি তাকে সাহায্য করেন।'

এই ঘটনার পর আবদুল কাদেরের প্রতি এলহাম হলো, 'আবদুল কাদের। বহির্জগত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধ তৌহিদের দিকে মনোনিবেশ করো। সত্বর আমি তোমাকে আশ্চর্য্য নিদর্শনসমূহ দেখাবো। তুমি অটলভাবে কেবল আমারই মোশাহেদায় মগ্ন থাকো। তুমি স্থির হয়ে একস্থানে অবস্থান করো। আমি তোমার মাধ্যমে আমার অনেক বান্দাকে আমার দিকে পথ প্রদর্শন করবো।'

শৈশবকাল থেকেই এরকম অনেক আলামত প্রকাশিত হতো আবদুল কাদেরকে কেন্দ্র করে। তিনি জানতেন সে সমস্ত। কিন্তু কোনোকিছুই তাঁকে সাধনার পথ পরিক্রমার প্রয়োজনের প্রতি শৈথিল্য আনতে পারেনি। তিনিতো প্রকৃত অর্থেই ছিলেন জন্মগত অলিআল্লাহ্। তাই আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানই বেলায়েতের পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধনার পথে তাঁকে নিয়োজিত করেছিলো সর্বোতভাবে।

একটি ছোট্ট বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বিরাটকায় বৃক্ষ। বীজ বপন, চারা জন্মানো, পানি সিঞ্চন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যার পরই কেবল পূর্ণ বৃক্ষ সুশোভিত হয় ফুলে ও ফলে। তেমনি কেউ আজন্ম অলি হলেও তাঁর বেলায়েতের পূর্ণ উন্মোচন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় কঠোর সাধনা ও পরীক্ষা।

মহানবী স. তো আদি পিতা আদম আ. এর পূর্বেও নবী ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও নবুয়তের পূর্ণ ভার উত্তোলনের যোগ্যতাপ্রাপ্তির জন্য জন্মগ্রহণ করবার পর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো চল্লিশটি বৎসর। হেরার গুহায় বসে নীরব সাধনায় কাটিয়ে দিতে হয়েছিলো দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

একটানা দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সুকঠিন সাধনার পর হজরত আবদুল কাদেরের হাতে এলো সফলতার সেই তেজদীপ্ত চিরন্তন সূর্য। সমস্ত সৃষ্টি জগতের মূল্যও যার কাছে কোনোকিছুই নয়। এখন শুধু সফলতা আর সফলতা। আলো আর আলো। বিজয় আর বিজয়।

কিন্তু সেই সমস্ত কঠোর সাধনার স্মৃতি কি ভয়ংকর। আল্লাহ্পাকের মেহেরবানির সীমা পরিসীমা নেই। এতো কষ্ট, এতো বিপদ, এতো প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি তাঁকে অটল রেখেছেন এপথে। নাহলে কার আর সাধ্য, ঐ সমস্ত অবর্ণনীয় সাধনায় কেউ সিদ্ধি লাভ করে। সেই সমস্ত কঠিন সময়ের কথা মনে হলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

সেই সমস্ত কঠিন সাধনার বিবরণ হজরত আবদুল কাদের নিজ মুখেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের নিকট বর্ণনা করেছেন। সবাই শুনেছেন সেকথা। শুনেছেন আর বিস্মিত হয়েছেন। এ রকম সাধনা কেবল হজরতের মতো সাধকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর মতো সাধক ক'জন আছে দুনিয়ায়?

হজরত বলেন, 'আমি সুদীর্ঘ পঁচিশটি বছর কাটিয়েছি ইরাকের বনে জঙ্গলে, বিজন প্রান্তরে আর বিধ্বস্ত পতিত বাড়ীতে। ঐ সময় আমারা নিকট অদৃশ্য জগতের ব্যক্তিগণ (রেজালুল গায়েব) আসতেন। আসতো অনেক জীন। আমি তাদেরকে তরিকত ও মারেফত শিখিয়ে দিতাম। প্রথম দিকে খিজির আ.ও আসতেন এবং আমার সঙ্গে অবস্থান করতেন কখনো। প্রথম দিকে আমি চিনতে পারিনি তাঁকে। তিনি আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন এই বলে যে, আমি কখনো তাঁর মতের বিরুদ্ধে যাবো না। একবার তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি এখানে অবস্থান করো, যতোক্ষণ আমি ফিরে না আসি।' আমি মেনে নিলাম তাঁর কথা। আমি হজরত খিজির আ. এর প্রতীক্ষায় রইলাম। এভাবে প্রতীক্ষায় কাটলো সুদীর্ঘ তিনটি বছর।

ঐ সময়ে দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভোগ বাসনাসমূহ বিভিন্ন আকৃতিতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। আল্লাহ্পাকের খাছ মেহেরবানি। তিনি সে সমস্ত কিছুর আকর্ষণ থেকে রক্ষা করতেন আমাকে। এরপর এলো শয়তান। বিকট মূর্তি ধরে সে আমাকে ভয় দেখাতো। সে আমার সঙ্গে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিতো। আমিও যুদ্ধ করতাম প্রাণপণে। আল্লাহ্পাকের রহমতে শেষে জয়লাভ হতো আমারই। তখন নফছও তার নিজস্ব রূপ ধরে তার আকাংখা পূরণের জন্য কাকুতি মিনতি করতো আমার নিকট। কখনো হয়ে উঠতো বিদ্রোহী। কিন্তু সেও পরাজিত হতো আমার কাছে। প্রথম প্রথম মোজাহেদার যে পদ্ধতি আমি অবলম্বন করেছিলাম নফছ তাতে সম্মত ছিলো। তাই দীর্ঘদিন ধরে আমি তখন ঘুরে বেড়াতাম নির্জন প্রান্তরে, মরুভূমিতে এবং বনে জঙ্গলে। নফছকে তখন আমি নিয়োজিত রাখতাম কঠোর রেয়াজতে। কখনো পুরো বছর পার হয়ে যেতো।

আমি দিন কাটাতাম শুধু মাত্র শাক সবজী অথবা অন্য কোনো কুড়ানো জিনিস খেয়ে। পানি পান করতাম না এতটুকুও। আবার কোনো বছরে কোনো সময়ের জন্য খানা পিনা এবং শয্যা গ্রহণ করা হয়ে উঠতো না আমার।

বাগদাদে কুরখ মহল্লার বিরান এলাকার প্রাচীন বাড়ীঘরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমি কাটিয়েছি কয়েক বছর। আমার ঐ সময়ের আহার ছিলো শুধু শাক সবজী। অন্য কিছু নয়। শরীরের একমাত্র আচ্ছাদন ছিলো একটি পশমী জুব্বা। বৎসরের প্রথম দিকে এক ব্যক্তি ঐ একটি করে জুব্বা আমাকে দান করতেন।'

হজরত আরো বলেছেন, 'দুনিয়ার অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা থেকে আমি বেঁচে থাকতে চেয়েছি প্রাণপণে। শিখেছি এক হাজার প্রকার এলেম। আমাকে পাগল (মজনুন) বলতো লোকেরা। আমি উদভ্রান্তের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো ভাবোন্মাদনায় খালি গায়ে গড়াগড়ি দিতাম কাঁটার উপরে। কাঁটার আঘাতে সারা দেহ থেকে ঝরতো তাজা রক্ত। মানুষেরা আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে ধরাধরি করে নিয়ে যেতো চিকিৎসকের কাছে। কখনো আমার অবস্থা এরকম পর্যায়ে পৌঁছাতো যে– লোকেরা ধারণা করতো, মৃত্যু হয়েছে আমার। লাশ দাফন করবার জন্য কাফনের কাপড় নিয়ে আসতো তারা। লাশ গোসল দেওয়ার উদ্যোগ নিলে আল্লাহ্পাকের অসীম কুদরতে আবার জীবন্ত হয়ে উঠতাম আমি।

হজরত বলেন, 'আমি চল্লিশ বছর এক নাগাড়ে ফজরের নামাজ আদায় করেছি এশার নামাজের অজু দিয়ে। সারারাত এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছি। এরকম করেছি একাধারে পনের বছর ধরে। একদিন রাতে নফছ আমার মনে এই ধারণা ঢেলে দিলো, সামান্য ঘুমিয়ে নিলে কি আর এমন ক্ষতি হবে? রাত তো এখনো বাকী আছে অনেক। পরে উঠে ইবাদতে মগ্ন হওয়া যাবে। চমকে উঠলাম আমি। নফছের প্ররোচনাকে প্রশ্রয় দিলাম না এতোটুকুও। সঙ্গে সঙ্গে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফ পাঠ করতে শুরু করলাম। এভাবেই পুরো এক খতম পাঠ করলাম আমি।

বোরজে আজমী নামক স্থানে হজরত কাটিয়েছিলেন দীর্ঘ এগারো বৎসর। সেখানেও তিনি নিমগ্ন ছিলেন বিরামহীন সাধনায়। বিচিত্র বর্ণনা সে সব। হজরত বলেছেন সে সব কথাও।

তিনি বর্ণনা করেছেন, 'বোরজে আজমীতে অবস্থানকালে আমি একবার আল্লাহ্পাকের সঙ্গে এরকম ওয়াদা করেছিলাম যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাকে নিজে হাতে না খাওয়াবে, ততোক্ষণ আমি কিছুই খাবো না। ততোক্ষণ পানিও পান করবো না, যতোক্ষণ না আমাকে কেউ পান করাবে। এই ওয়াদার পর চল্লিশ দিন বিনা পানাহারে কেটে গেলো আমার। চল্লিশ দিন পর একজন লোক এসে কিছু খাবার এনে আমার সামনে রেখে চলে গেলো। আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছিলো যে,

এখনই আহার শুরু করে দেই। কিন্তু সেই ওয়াদার কথা মনে পড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। ভিতর থেকে ক্রমাগত 'ক্ষুধা ক্ষুধা' বলে চিৎকার শুরু হয়ে গেলো। সে চিৎকার বন্ধ হচ্ছিলো না কিছুতেই। এমন সময় আমার পীর শায়েখ আবু ছাইদ মখজুমী র. হাজির হলেন সেখানে। তিনিও শুনতে পেলেন সেই 'ক্ষুধা ক্ষুধা' চিৎকার। বললেন, 'হে আবদুল কাদের। এ অবস্থা কেনো?' আমি বললাম রূহ তো আল্লাহ্‌র ধ্যানে বিভোর হয়ে আছে। কেবল নফছ চিৎকার করছে ক্ষুধা ক্ষুধা বলে।' আমার কথা শুনে শায়েখ আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। তারপর নিজ হাতে আমার মুখে তুলে খানা খাওয়ালেন তিনি। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমি আহার গ্রহণ করলাম।

শয়তান মানুষের প্রধান শত্রু। শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না করতে পারলে কিছুতেই সাধনার পথে সফলতা লাভ হয় না। কিন্তু শয়তান কি সহজে পরাজয় মানে? যুদ্ধ করে কাবু করতে হয় তাকে। শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থার বর্ণনাও অতি অদ্ভুত। সে সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনাও হজরত দিয়েছেন এভাবে–

'শয়তান সদলবলে আমার প্রতি আক্রমণ করতো। তারা আগুন নিক্ষেপ করতো আমার দিকে। কিন্তু এসব দেখে ভয় পেতাম না আমি। আমি তখন নিজের মধ্যে এমন শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা অনুভব করতাম, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গায়েব থেকে নির্দেশ দেয়া হতো আমাকে, 'হে আবদুল কাদের। ওঠো। মোকাবেলা করো শয়তানদের। আমি তোমাকে সাহায্য করবো এবং তাদের আক্রমণ থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করবো।'

আমি তাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেই দৌড়ে পালাতো সবাই। কিন্তু একটা শয়তান তবুও দাঁড়িয়ে থাকতো। সে ভয় দেখাতো আমাকে। আমি তখন তাকে প্রচণ্ড জোরে চড় মারতাম। চড় খেয়ে পালাতো সে। আমি তখন 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' পড়তাম। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যেতো শয়তানটির গায়ে।

একসময় একজন কুঁৎসিত দুর্গন্ধযুক্ত লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো সে, 'আমি ইবলিস। তুমি আমার বাহিনীকে পরাজিত করেছো। এখন কি আর করি। এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই।' আমি বললাম, দূর হ শয়তান। তোকে কখনো কি বিশ্বাস করা যায়? আমার কথা শেষ হতে না হতেই একটা অদৃশ্য হাত এসে তার মাথায় বসালো এক প্রচণ্ড চড়। চড়ের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মাটির মধ্যে গেড়ে গেলো সে। কিছুক্ষণ পর আবার উঠলো মাটির ভিতর থেকে। এবার সে বিরাট অগ্নিকুণ্ড নিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম একটা সবুজ রঙের ঘোড়ায় চড়ে এক ব্যক্তি আসছেন। অশ্বারোহী ব্যক্তিটি আমাকে একটি তলোয়ার দিলেন। আমি ঐ তলোয়ার তুলতেই দ্রুতবেগে পালিয়ে গেলো ইবলিস।

কিছুক্ষণ পর আমি আবার দেখতে পেলাম ইবলিসকে। সে কিছুদূরে বসে করুণ সুরে কাঁদছে। সে মাটিতে মাথা কুটছে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে, 'হায় হায়। আবদুল কাদের আমাকে একেবারে নিরাশ করে দিয়েছে।' আমি ধমক দিয়ে উঠলাম তাকে, 'দূর হ খবিছ। তোর কুমন্ত্রণাকে আমি সব সময় ভয় করি। তারপর সে আমার চারপাশে এক ধরনের জাল বিস্তার করলো। আমি প্রশ্ন করলাম, 'এ সমস্ত কি?' সে বললো, 'এই জাল হলো কুমতলবের (ওয়াছওয়াছার) জাল। এই জাল দিয়ে আমি তোমাদের মতো লোকদেরকে ফাঁদে ফেলি। 'আমি তখন সেই কুমন্ত্রণার জাল ছিন্ন করতে শুরু করলাম। একবছর অতিক্রান্ত করার পর ইবলিসের কুমন্ত্রণার জাল সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করলাম আমি।

এই ঘটনার পর আমার অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হলো। আমি দেখতে পেলাম আমার কলব বিভিন্ন প্রকার আবিলতায় ভরে আছে। আমি প্রশ্ন করলাম মনে মনে, ঐ সমস্ত কি জিনিস? অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, ঐগুলি তোমার কামনা বাসনার প্রতিরূপ। আমি এক বছর ধরে আবিলতা অপসারণের চেষ্টায় নিয়োজিত রইলাম। শেষ পর্যন্ত কামনা বাসনার আবিলতা থেকে আমার কলব সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেলো।

এরপর এলাম তাওয়াক্কোলের স্তরে। দেখলাম, এ স্তরে বিভিন্ন গ্রন্থি জট পাকিয়ে রয়েছে। তাওয়াক্কোলের তীক্ষ্ণ তরবারী দিয়ে সে সমস্ত ছিন্ন করলাম আমি। ছিন্ন করলাম আনুষংগিক আরো অনেক প্রতিবন্ধকতা। এর পর পৌঁছলাম কৃতজ্ঞতার (শোকরের) স্তরে। সেখানেও বাধাবিঘ্ন অপসারণ করতে হলো অনেক।

এরপর মোশাহেদার (দর্শনের) স্তর এলো সামনে। তারপর এলাম ফকরের অধ্যায়ে। এই অধ্যায় পাড়ি দিয়ে যখন আমি আরও গভীরে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম পূর্ববর্তী সমস্ত স্তর এখানে এক সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আছে। তখন বিরাট বিজয় লাভ হলো আমার। দেখলাম, আমার রূহ এখানে পেয়েছে সম্মান, মর্যাদা এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। এখানে এসে আমি নিজের বিলীন সত্তাকে আবার ফিরে পেলাম। এ অবস্থা অভিনব।'

শয়তান সম্পূর্ণ পরাজিত হলেও সব সময়ই সে থাকে সুযোগের সন্ধানে। বিশেষ করে খাছ অলি আল্লাহ্‌গণের প্রতিই ইবলিসের থাকে তীক্ষ্ণ নজর। অপেক্ষা করতে থাকে সে জীবনভর, কোনো অসতর্ক মুহূর্তে যদি তাঁর পদস্খলন ঘটানো সম্ভব হয়, তবেইতো সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে সাধকের।

হজরত আবদুল কাদেরকেও একবার পড়তে হলো ইবলিসের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের সামনে।

হজরত বর্ণনা করেন, একবার এক সফরের সময় নির্জন জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম আমি। কয়েকদিন কেটে গেলো। পানাহার হলো না কিছুই। পিপাসায় বুক শুকিয়ে গিয়েছে। এমন সময় আমার মাথার উপরে এসে দাঁড়ালো এক খণ্ড মেঘ। কিছু বর্ষণও হলো মেঘ থেকে। সেই পানিতে পিপাসা মিটালাম আমি।

এরপর হঠাৎ আসমানের দিকে দেখতে পেলাম একটি নূর। সে নূরে আসমানের একাংশ আলোকিত হয়ে গিয়েছে। ঐ আলোর মধ্যে একটা কিরকম আকৃতিও দেখা গেলো। সে আমাকে সম্বোধন করে বললো, 'হে আবদুল কাদের। আমি তোমার আল্লাহ্। আমি আজ থেকে তোমার জন্য সমস্ত হারাম বস্তুকে হালাল করে দিলাম। একথা শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করলাম, 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম।' সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম আকাশের নূর দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। শব্দ হলো, 'তুমি আল্লাহ্র খাছ রহমতপ্রাপ্ত বলে আমার এই ধোঁকা থেকে রেহাই পেলে। আমি এ পর্যন্ত এভাবে সত্তরজন অলিকে পথভ্রষ্ট করেছি।' আমি তখন বললাম, 'মরদুদ। শয়তান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহম করম আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

ইতিহাস এখন অন্য এক অধ্যায়ের প্রতীক্ষা করছে। সে অধ্যায় অনন্য অধ্যায়। মানবতার গতানুগতিক প্রবাহে এবার আসবে প্রাণের অফুরন্ত স্পন্দন। কালের আকাশে এবার সোবহে সাদেকের আলোকাভাস।

বাগদাদের অলিতে গলিতে বহুসংখ্যক ওলামা ও মাশায়েখ হেদায়েত কার্যে রত। যদিও তাঁরা নক্ষত্র ও চন্দ্রের মতো আলোকিত করে রেখেছেন দ্বীনের আসমান। তবুও রাতের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না তাতে। আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা, এবার তিনি রাতের আকাশ ফুঁড়ে জাগিয়ে তুলবেন হেদায়েতের পূর্ণ অরুণোদয়কে। সেই সূর্যোদয়ের সময় সমাগত। সেই সোবহে সাদেকের আড়াল থেকে তার নীরব হাতছানি দৃশ্যমান। জীলানের সেই প্রতীক্ষিত সূর্য।

হজরত আবু ছাইদ মখজুমী র. বুঝি স্পষ্টভাবেই বুঝলেন সে কথা। বুঝলেন, তাঁরও সময় বেশী নেই আর। অচিরেই মাশুকের দরবার থেকে এসে পড়বে আখেরী সমন। তাই তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অর্পণ

করলেন হজরত আবদুল কাদেরের নিকট। হজরত আবদুল কাদেরও নিজ মোর্শেদের এই মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করেই গ্রহণ করলেন হেদায়েত ও এশায়াতের প্রাথমিক পরিকল্পনা।

কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে এলো বছর। পাঁচশ' বারো হিজরী শেষ। শুরু হলো হিজরী পাঁচশ' তেরো। শুরুতেই শেষ হয়ে গেলো প্রিয় মোর্শেদের দুনিয়ার জীবন। পহেলা মহররমই হজরত আবু ছাইদ মখজুমী র. যাত্রা করলেন অনন্ত লোকের দিকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন।

ঘটনা গড়িয়ে চললো দ্রুত।

সমাজের সর্বস্তরে দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব ধীরে ধীরে চেপে বসছে আবদুল কাদেরের স্কন্ধে। এবার কাজ শুরু করতে হবে। আল্লাহ্ মদদগার। তাঁর তরফ থেকে এই মহান কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দ্রুত বর্ষণ হচ্ছে হজরতের উপরে। প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন আলামত। গায়েবী ইঙ্গিত।

একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে ক্ষীণকায় ও দুর্বল এক ব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাত হলো তাঁর। লোকটি এতো দুর্বল যে, ভালোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছিলো না। সে হজরত আবদুল কাদেরের নিকট ফরিয়াদ করলো, 'সবাই আমার প্রতি বিমুখ। আমি অসহায়। কে আমাকে সাহায্য করবে? আপনি অনুগ্রহ করে আমার হাত ধরুন। সাহায্য করুন আমাকে। আমি যেনো আপনার সাহায্যে ভালোভাবে দাঁড়াতে পারি। আপনি তো রূহানী চিকিৎসক। নিরাময় করুন আমাকে। মৃতপ্রায় এই জীবনে আনুন পূর্ণ জীবনের প্রাণস্পন্দন।'

দরদে পরিপূর্ণ হজরত আবদুল কাদেরের মন। তিনি এগিয়ে গিয়ে লোকটির হাত ধরলেন। কিছু দোয়া কালাম পড়ে ফুঁ দিলেন তার গায়ে। মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেলো লোকটির অবস্থা। তার মুখাবয়ব হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। শরীর হয়ে উঠলো সুস্থ সবল। নতুন জীবন পেলো সে।

হজরত তখন তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, 'তোমার নাম কি? কোথায় তোমার আবাস? কেমন করে হলো তোমার এই অসহায় অবস্থা, বলো?

লোকটি জবাবা দিলো প্রশ্নের। জবাব শুনে স্তম্ভিত হলেন হজরত।

লোকটি বললো, 'আপনি আমাকে চিনতে পারেননি এখনো? আমি দ্বীন। সেই দ্বীন যা অবতীর্ণ হয়েছিলো আপনার নানা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। তিনি স. ও তাঁর সাহাবীগণ রা. আমাকে পূর্ণ শক্তি দান করেছিলেন। তখন আমার পরাক্রমে প্রকম্পিত ছিলো সারা জাহান। কিন্তু আজ? আজ কওম বিস্মৃত হয়েছে আমাকে। আজ আমি দুর্বল, সহায় সম্বলহীন। আমি আমার সেই অসহায় জরাগ্রস্ত রূপেই হাজির হয়েছিলাম আপনার সামনে। কিন্তু এখন আমি রোগমুক্ত। আপনার রূহানী শক্তির প্রভাবে এখন আমি পেয়েছি নতুন জীবন। তাই আমি আপনাকে অভিহিত করছি মুহিউদ্দিন বলে। আপনি মুহিউদ্দিন (দ্বীন পুনরুজ্জীবনকারী)।

হজরত চমকিত হলেন। একি দৃশ্য দেখলেন তিনি। অভূতপূর্ব অভিনব এক রূহানী অবস্থায় ছেয়ে গেলো তাঁর সমস্ত সত্তা। যেনো তাঁর সাথে আলোড়িত হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ। চারিদিক থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সেই একই উচ্চকিত আওয়াজ 'মুহিউদ্দিন' 'মুহিউদ্দিন'। শ্রবনেন্দ্রিয়ের পরদা মনে হয় চৌচির হয়ে যেতে চায় সেই বুলন্দ আওয়াজে। অগণিত কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে, বার বার উচ্চারিত হচ্ছে সেই একই শব্দের বিরামহীন নিনাদ, 'মুহিউদ্দিন, মুহিউদ্দিন-মুহিউদ্দিন মুহিউদ্দিন।'

আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো এক রাতে। অদ্ভূত এক স্বপ্ন দেখলেন তিনি। দেখলেন, স্বয়ং রসূলেপাক স. আগমন করেছেন। তিনি এরশাদ করলেন, 'মানুষের নিকট ভাষণ দাও। নসিহত করো সবাইকে।'

হজরত আবুদল কাদের আরজ করলেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি যে আজমী। আরবীভাষী মানুষের এই শহরে বিশুদ্ধ আরব না হয়ে কি করে ওয়াজ করা সম্ভব আমার পক্ষে?

আবদুল কাদেরের উক্তি শুনে রসূলেপাক স. নির্দেশ দিলেন তাঁকে 'মুখ খোলো।'

নির্দেশ মোতাবেক মুখ খুললেন তিনি। রসূলেপাক স. তখন তাঁর নিজের মুখের লালা পরপর সাতবার লেপন করে দিলেন আবুদল কাদেরের মুখে। তারপর সেই একই নির্দেশ পুনরায় দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন মহানবী মোস্তফা স.।

স্বপ্ন ভেঙে গেলো হজরত আবদুল কাদেরের। মনে হলো তিনি এখন যেনো অন্য মানুষ। অন্তরে দুর্বলতা, দ্বিধা সংকোচের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই আর। মহানবী মোস্তফা স. এর দীদার ও দোয়ার বরকতে তিনি এবার সত্যিই মুহিউদ্দিন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর বুকে মুখে যেনো সেই আবেহায়াতের অন্ত হীন প্রস্রবণ, যা মিটিয়ে দিতে পারে অগণিত মানুষের আল্লাহ্প্রেমের দুরন্ত পিপাসা। তাঁর দুচোখে যেনো সেই জ্বলন্ত সূর্য অনির্বাণ জ্বলছে, যা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে তমসাচ্ছন্ন সমাজ জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কে।

কাজ শুরু করলেন তিনি। বাবুল আজাজ মাদ্রাসার প্রাঙ্গণেই তিনি শুরু করলেন তাঁর পবিত্র ভাষণের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালা। সে ভাষণের চমকে চমকিত হলো মানুষ। সে আলোর ঝলকে সচকিত হলো সমাজ জীবন। স্থবিরতার গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হতে লাগলো একে একে। যেনো মৃতপ্রায় দজলায় বান ডেকেছে এবার। বাগদাদের বাতাস হয়েছে চঞ্চল। বাগদাদের বাগান ভরেছে ফুলে ফলে। বাগদাদের বাসিন্দা পেয়েছে নতুন জীবন।

মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে শ্রোতাদের ভীড় বেড়ে যায়। ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে লোক সমাগম। তার পবিত্র ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় মুক্ত হয় সবাই দুনিয়ার মোহ থেকে,

পার্থিব মর্যাদা লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে, সত্তার কারাগার থেকে। সে বেহেশতী বাণীর প্রভাবে বেঁহুশ হয়ে যান কতোজন। অনুতাপের আগুন জ্বলে ওঠে মনে, কৃত অপরাধবোধের কারণে। সে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যান কেউ কেউ। মজলিশ শেষে দেখা যায়, কারো কারো সাঙ্গ হয়েছে জীবনলীলা। তবু মানুষ আসে। যেমন আলোর আহবানে প্রেমিক পতঙ্গ না এসে পারে না আলোর কাছে। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পতঙ্গকে আসতে হয় আলোর দিকে। আসতেই হয়।

মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে স্থান সংকুলান হয় না। পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাগণ তাই ছেড়ে দেন তাঁদের স্থান। মাদ্রাসার আয়তন বেড়ে যায়। তবুও স্থান সংকুলান হয় না। লোকজনকে স্থান নিতে হয় পাশের রাস্তায়। এখানে সেখানে।

চলে মহফিল। হজরত আবদুল কাদের দিয়ে চলেন আল্লাহপ্রেমের দাওয়াত। দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে সংবাদ। লোক সমাগম বাড়তেই থাকে দিন দিন।

জুমআর দিন ভোরে এবং মঙ্গলবার দিন বিকেলে তিনি ভাষণ দান করেন আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে। আর রবিবার দিন সকালে নিজের খানকায় বক্তৃতা দেন নিজ মুরিদগণের উদ্দেশ্যে।

কখনো আবেগ। কখনো উচ্ছ্বাস। কখনো অন্তর্ভেদী আহবান। কখনো প্রতিবাদ। কখনো দ্বীনের দুশমনদের কঠোর সমালোচনা। কখনো তৌহিদের বিশ্লেষণমূলক বৃত্তান্ত। কখনো মারেফাতের নিগুঢ় রহস্য উদঘাটন। মহফিল চলে। দিন মাস বছর ধরে চলে।

শুধু সাধারণ মুসলমান নয়। মজলিশে নিয়মিত হাজিরা দিতে থাকেন প্রখ্যাত আলেম ওলামা, প্রসিদ্ধ পীর মাশায়েখ, পরাক্রমশালী আমির ওমরাহ সবাই।

হাজির হতে থাকেন বিধর্মীরাও। ইহুদী খৃষ্টান অনেকে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন হজরতের হাতে। তাঁর প্রখর সূর্যের মতো ব্যক্তিত্বের পরশে কেটে যায় সবারই মন থেকে পাপপ্রবৃত্তি, দোদুল্যমানতা ও অবিশ্বাস।

বিশ্বাসের বিপর্যস্ত বাগানে হাসে পুষ্পের মেলা। মুখরিত হয় বাগান বুলবুলির কুজনে।

হজরত বলে চলেন। বলেই চলেন নিয়মিত। যেনো বয়ে চলেছে বেহেশতের চিরপ্রবহমান সালসাবিলের স্রোতধারা। সে সুখময় স্রোতের সংস্পর্শে এসে মানুষের মরুমন ভরে উঠছে আবাদের আয়োজনে। মানবতার মাঠ ঘাট প্রান্তর ভরে উঠছে শস্যের সম্ভারে।

আবেগ ভরা আহবান জানালেন তিনি সবাইকে, 'হজরত রসূলে করিম স. এর দ্বীনের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ছে ক্রমশঃ। প্রাচীর হয়ে পড়েছে দুর্বল। হে জমিনের অধিবাসীবৃন্দ! এসো। দুর্বল এই দ্বীনকে মজবুত করে গড়ে তুলি। ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে তুলি একে। এ কাজতো একার কাজ নয়। এ কাজের জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত শক্তির। হে চন্দ্র। হে সূর্য। হে দিবস। সাড়া দাও। তোমরা সকলেই সাড়া দাও এ ডাকে।

'ফাছেক, বেদাতী, পথভ্রষ্ট এবং দ্বীনের পোশাকী ব্যক্তিগণের কার্যকলাপে দ্বীনের জীবন অতিষ্ঠ। অতীতের বুজর্গগণের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। তাঁরাতো আহার-বিহার কোনো কিছুই পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠ। দ্বীনের প্রচারের কাজে ছিলেন সদাসতর্ক। আজ তোমরা বিস্মৃত হয়েছো তাদের তিতিক্ষার ইতিহাস। তোমাদের হৃদয় এতো কঠিন। এতো পাষাণ তোমরা ! দেখো। ভালোভাবে, গভীরভাবে ভেবে দেখো। কুকুরও তার প্রভুর প্রতি কিরূপ অনুগত। নিজের প্রভুকে দেখলে সে কিরকম আনন্দিত হয়। আর তোমরা কিরূপ? তোমরা আল্লাহ্‌পাকের নিয়ামত দিয়ে তোমাদের উদরপূর্তি করছো। অথচ তাঁর হুকুম আহকাম সম্পর্কে তোমরা বেখবর। শরীয়তের সীমা লংঘন করে যাচ্ছো বারবার।'

মানুষকে আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। মানুষ আল্লাহ্‌পাকের বান্দা। মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী চলাই দাসের মূল কর্তব্যকর্ম। তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের স্বভাব হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে বার বার। মেহেরবান প্রভুর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে থাকে মানুষ। প্রবৃত্তি তাকে পরিচালিত করে তাকে ধ্বংসের দিকে। আল্লাহ্‌পাকের আজাবের দিকে। সহজাত অকৃতজ্ঞতার কলুষতায় তখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মানুষের জীবন। ফলে শুরু হয় অনাচার, দুর্নীতি ও অশান্তি। সুখ দুঃখ সর্ব অবস্থাতেই প্রবৃত্তি (নফছ) ভুলে যায় তার দায়িত্বজ্ঞান। ভুলে যায় কৃতজ্ঞতাবোধ।

নফছের বিপদ থেকে মুক্ত থাকবার প্রতিষেধক দিলেন হজরত এভাবে—

যখন নফছ সম্পদপরিবেষ্টিত অবস্থায় সুখে দিনাতিপাত করতে থাকে, তখন সে হয়ে ওঠে অহংকারী। আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় আত্মম্ভরিতায়। করতে থাকে নিজের কামনা বাসনার অন্ধ অনুসরণ। যখনই তার পূর্ণ হয় এক কামনা, তখনই সে লিপ্ত হয় দ্বিতীয় কামনার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায়। তাঁর হস্তগত নেয়ামতসমূহের

প্রতি সে করতে থাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য। আরও উন্নত ধরনের নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য সে শুরু করে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাথ– যা তার ভাগ্যে অনুপস্থি। এইরূপ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা প্রশস্ত করে তার ধ্বংসের পথ। অথচ বলা হয়েছে, যা ভাগ্যে নির্ধারিত হয়নি, তা প্রাপ্তির প্রচেষ্টা এক ধরনের কঠিন শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আবার যখন নফছ হয় বিপদগ্রস্ত, তখন শুধুমাত্র বিপদমুক্তি ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করে না সে। উন্নততর নেয়ামতের আকাংখা তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় একেবারে। কিন্তু যখনই মুক্ত হয় বিপদ থেকে, তখনই আবার তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ধন সম্পদ সম্মান মর্যাদা লাভের দুর্বার আকাংখা। সে তখন পুনরায় পরিত্যাগ করে তাঁর প্রভুর নির্দেশনামা। সে তখন পূর্বের মতো লিপ্ত হয় পাপাচারে। ভুলে যায় বিপদ মুসিবতের তিক্ত স্মৃতি, যেমন বিপদের সময় ভুলে গিয়েছিলো সম্পদ প্রাপ্তির আনন্দ।

আল্লাহ্পাক তখন তার অকৃতজ্ঞতার শাস্তি স্বরূপ আবার তার প্রতি আরোপিত করেন বিপদ মুসিবত। এতে করে ভবিষ্যতের পদস্খলন থেকে নিরাপদ হয়ে যায় সে।

নফছ নেয়ামত ও সম্পদের মর্যদা রাখতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু বিপদ তাকে সম্পদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের হক থেকে রক্ষা করেছে।

যদি নফছ প্রথম বার বিপদমুক্তির পর শিষ্টাচার রক্ষায় সতর্ক থাকতো, আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতে লিপ্ত থাকতো, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো এবং তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতো তবে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানই হতো মঙ্গলময়। তার সম্পদ বেড়ে যেতো বহুগুণ। আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতো সে। পেতো নিরাপত্তা ও শান্তি।

অতএব, যে ব্যক্তি ইহপরকালে নিরাপত্তাপ্রত্যাশী, তার উচিত বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা, সম্পদের প্রাচুর্যতার মধ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং মানুষের কাছে অভিযোগ পেশ করবার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকা। মালিকের নিকটই যাবতীয় অভাব অভিযোগ পূরণের প্রার্থনা করা উচিত। তাঁর হুকুমের তাবেদারী করা, স্বচ্ছলতার জন্য ছবর করা এবং অপর সকলের সঙ্গে অন্তরের সর্ম্পক ছিন্ন করে একমাত্র সেই মহামহিম মালিকের ধ্যানেই নিমগ্ন থাকা উচিত।'

প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্যই যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন নবী রসূলগণ। প্রবৃত্তির সঙ্গে নয়, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে অবস্থান করার মধ্যেই রয়েছে সফলতা। আল্লাহ্পাকের মেহেরবানির সীমা পরিসীমা নেই। তিনি তাই বার বার তাঁর নির্বাচিত বান্দাগণের মাধ্যমে মানুষকে ডাক দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্বের। প্রবৃত্তির অন্ধকারে বন্দী জীবন যাপন তাই মানুষের জন্য অশোভনীয়। প্রবৃত্তির কারাগার থেকে নাজাতের উন্মুক্ত আসমানের দিকে উড়ে

আসবার জন্য তাই তিনি তাঁর প্রিয় ব্যক্তিগণের মাধ্যমে পাপিষ্ঠ মানুষকে আহ্‌বান জানিয়েছেন কতোবার। এ মেহেরবানির কি অন্ত আছে?

হজরত আবুদল কাদের তাই প্রবৃত্তির প্ররোচনার স্বীকার অধঃপতিত মানব সমাজকে আহ্‌বান জানালেন আবেগাপ্লুত ভাষায়।

তিনি বললেন, 'তোমরা নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসো। ভোগবিলাসের প্ররোচনা থেকে। হয়ে যাও পৃথক, প্রবৃত্তি থেকে। তোমার অস্তিত্বের রাজ্যের প্রতি হও বিমুখ। তোমার সমস্ত কিছু সোপর্দ করো মহামহিম আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট। এরকম করে তুমি আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে তোমার হৃদয়ের রক্ষক হয়ে যাও। আল্লাহ্‌পাক তাঁর মর্জি মতো যা কিছু তোমার অন্তর্জগতে প্রবেশের অধিকার প্রদান করবেন, একমাত্র তাকেই অনুপ্রবেশ করাও তোমার অন্তরে এবং যা কিছুর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, প্রতিরোধ করো তাকে। তাঁর বিধি নিষেধ পালন করো বর্ণে বর্ণে।

অতএব, একবার যে কামনা বাসনাকে তুমি দূর করেছো তোমার অন্তর থেকে, তাকে আর প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিও না মনে। প্রতিরোধ করো নিজেকে। নিজের কামনা বাসনাকে।

আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো ইচ্ছাই তুমি অন্তরে পোষণ করো না। এর ব্যতিক্রম করা মারাত্মক। এই অপরাধ সংঘটিত হলে ধ্বংস ও বিনাশের দিকে শুরু হবে তোমার যাত্রা। তুমি সরে যাবে আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহের নজর থেকে। বিচ্ছেদের যবনিকায় ঢেকে যাবে তোমার অস্তিত্ব।

আল্লাহ্‌পাকের আদেশ পালনের জন্য সব সময় সতর্ক থাকো। চিরদিনের জন্য মুক্ত রাখো নিজেকে নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু থেকে। তাঁর মর্যাদার নিকট করো নির্বিবাদ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো সৃষ্টিকে তাঁর অংশী মনে করো না। তোমার ইচ্ছা কামনা বাসনা তাঁরই সৃষ্টি। কাজেই তোমার ইচ্ছা কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করো। যাতে করে তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি অংশী স্থাপনের অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে পারো।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর মিলন কামনা করে তাকে অবশ্যই সৎকাজ করতে হবে এবং তাঁর প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক করা চলবে না।'

মূর্তি পূজা করলে শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার শরীক করা হয় না। বরং প্রবৃত্তির কামনার অনুগমন করলেও শরীক করা হয়। আল্লাহ্‌র সঙ্গে আল্লাহ্‌ ছাড়া ইহ পরকালের কোনোকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাঁর সঙ্গে শরীক করা হয়।

দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ ভুলে যায় তার প্রতিপালককে। অথচ তিনি ছাড়া মানুষের প্রকৃত অর্থে কোনো বন্ধু নেই। দুনিয়াপ্রীতিও মানুষের এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্যও তিনি জানালেন দরদভরা আমন্ত্রণ-

'যিনি তোমার প্রতি রেখেছেন তাঁর সার্বক্ষণিক দৃষ্টিপাত, তুমিও তাঁর দিকে তাকাও। যিনি সর্বক্ষণ তোমার সামনে, তুমিও তাঁর সামনে হাজির থাকো। যিনি তোমাকে প্রকৃতই ভালবাসেন, তুমিও ভালোবাসো তাঁকে। তুমি ডাক শোনো তাঁর, যিনি তোমাকে ডাকছেন। তুমি সমর্পণ করো নিজেকে তাঁরই হাতে, যিনি তোমাকে পতন উন্মুখ অবস্থা থেকে একমাত্র উদ্ধারকারী। যিনি তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, ধ্বংস থেকে মুক্ত করেন, তোমার অপবিত্র অস্তিত্ব যিনি পবিত্র করেন, কদর্যতা, হতাশা ও পথভ্রষ্টতা থেকে যিনি তোমাকে রক্ষা করেন, তুমিও তাঁর দিকে অগ্রসর হও। তোমার প্রবৃত্তি এবং অসৎ সহচরগণই পবিত্র ও উত্তম নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তোমাকে। আর কতোদিন তুমি অভ্যাসের দাসত্বে লিপ্ত থাকবে? কতোদিন করবে মানুষের গোলামী? কতোদিন করবে কামনা বাসনার অনুগমন? কতোদিন দুনিয়া দুনিয়া করে করবে হা-হুতাশ? দয়াময় আল্লাহ্‌র দিক থেকে কতোদিন মুখ ফিরিয়ে রাখবে আর? ভেবে দেখো, তুমি কোথায় চলেছো? তোমরা প্রায় সময়ই বলে থাকো, যা আমরা চাই তা পাই না। প্রিয়জনদের সঙ্গে হয় বিচ্ছেদ। আমাদের অর্থসম্পদ হয়ে যায় বিনষ্ট।

হে আল্লাহ্‌র বান্দা। তুমি কি শোনোনি, আল্লাহ্‌পাক জ্বীন এবং ইনসানকে পয়দা করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করবার জন্য। তুমি কি জানো না রসুলেপাক স. এর পবিত্র বাণী, 'যখন আল্লাহ্‌পাক তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তার উপরে চাপিয়ে দেন বিপদ আপদের বোঝা। ঐরূপ অবস্থায় যখন সে ধৈর্য্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ্‌পাকই তাকে অবশেষে উদ্ধার করেন। মানুষেরা প্রশ্ন করে, ইয়া রসুলাল্লাহ! এরূপ করবার অর্থ কি? হজরত স. বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর মহব্বতের সঙ্গে অন্য কারো মহব্বত মিশ্রিত করেন না। তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত তাকে আল্লাহ্‌র একক মহব্বতের মর্যাদা করবে খণ্ড বিখণ্ড। ফলে সত্য ও অসত্য মিশ্রিত হয়ে পড়বে। আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া অন্যায়। তিনি একক। মহাসম্মানিত। মহামর্যাদাবান। তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান এবং সব কিছুর উপরে বিজয়ী। তাই তিনি তাঁর শরীককে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এইভাবে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণের অন্তরকে গায়রুল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে বিশুদ্ধ করে দেন। তখন তাঁর প্রিয় বান্দার অন্তর এককভাবে তাঁরই প্রতি নিবদ্ধ হয়। তখনই ঐ বান্দার প্রতি প্রযোজ্য হয় আল্লাহপাকের সেই বাণী, 'আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন।'

সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে কুফরি, বেদাত ও কুসংস্কারের জুলমত। বিলাসিতার প্রবাহে গা ভাসিয়েছে কেউ কেউ। হুকুমতও শরীয়তের আইন প্রতিষ্ঠায় অমনোযোগী। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সমস্তই হয়ে পড়েছে কলুষিত। এই বিশাল সমাজদেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নবজীবনের স্পন্দন জাগানোর দায়িত্ব সহজ দায়িত্ব নয়।

হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা সঙ্গত নয়। হুকুমতের সংশোধন প্রয়োজন। মানুষই যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে যতোবারই মানুষ বদল হোকনা কেনো, কিছুতেই শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না জনজীবনে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গের উপরে প্রভাব বিস্তার করবার জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড রুহানী শক্তির। যারা এই শক্তির অধিকারী নয়, তারাই কেবল ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার নামে জনজীবনে আমদানী করে বিশৃঙ্খলা। তাঁদের অস্বচ্ছ প্রবৃত্তির ধারণায় এই ফেৎনাই 'জেহাদ' বলে প্রতিভাত হয় তাদের কাছে।

কিন্তু হজরত আবদুল কাদের র. তো তাদের মতো অপরিণত এবং রূহানী শক্তি বিবর্জিত ব্যক্তি নন। তাই তিনি বেছে নিলেন সংশোধনের পথ। দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তো শুধু শাসকশ্রেণীর নয়। শুধু জনতার নয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টার। এর সম্মেলনের জন্য ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন। সেইরূপ ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহ্‌পাকের রঙে পূর্ণরূপে রঞ্জিত। সেইরূপ ব্যক্তিত্ব যার ভিতর ও বাহির পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়েছে শরীয়তের সজ্জায়। সেইরূপ ব্যক্তিত্ব যিনি পূর্ণ জ্ঞানধারী। যিনি অর্জন করেছেন উভয় প্রকার এলেম– জবানী এলেম এবং কলবী এলেম। যারা শুধুমাত্র জাহেরী এলেম শিক্ষা করেই একামাতে দ্বীনের (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) জন্য মানুষকে ডাক দেন, তারা তো সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা আমদানী করবেই। দ্বীন সম্পর্কে যাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ তারা কি করে প্রতিষ্ঠিত করবে পূর্ণ দ্বীন?

হজরত আবদুল কাদের ছিলেন দ্বীনের পরিণত মোবাল্লেগ (প্রচারক) এবং গায়েবী মদদপ্রাপ্ত দ্বীন-সংস্কারক। তাই নবী আ.গণের মতো তাঁর হৃদয় ছিলো

মানব প্রেমে ভরপুর। মানুষের সংশোধন হোক, মানুষ সম্পর্ক স্থাপন করুক তার প্রভুর সঙ্গে। তওবা করুক অতীত কৃতকর্ম থেকে। সাধারণ জনতা, আলেম, শায়েখ, খলিফা আমির ওমরাহ সবারই জন্য প্রত্যাবর্তনের পথ উন্মুক্ত। অভাব শুধু দরদী আহবানকারীর। সেই দরদেরই তো অভাব, যার ডাকে মানুষের অন্তর বিগলিত হয়। সেই প্রেমিকই তো প্রস্তুত হয় না সমাজে, যার কারণে বাদানুবাদ, সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলায় বার বার বিপর্যস্ত হয় প্রেমময় মানবতা।

হজরত আবুদল কাদের রসুলেপাক স. এর পূর্ণ অনুসরণকারী। তাঁরই দ্বীনের সংস্কারক। তাই তাঁরই মতো নির্ভুল সংস্কারসূচী প্রণয়ন করলেন তিনি। খলিফার প্রতি, আমির ওমরাহদের প্রতি, তাদের মোসাহেব অসৎ আলেম এবং প্রশাসনের আনুকূল্যলোভী পীর দরবেশদের প্রতি এবং ব্যাপক জনজীবণের প্রতি দরদভরা আহবান জানালেন তিনি। ফিরে এসো সবাই। সবাই সংশোধন করো নিজেদেরকে। পূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরীক হও সবাই।

খলিফা মোছতাজহার বিল্লাহ্ তখন বাগদাদের খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত। অল্প বয়সে তিনি এসেছিলেন ক্ষমতায়। প্রশাসনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি তিনি। আমির ওমরাহদের প্রতি নির্ভর করতে হয় তাকে অনেকখানি। আর আমির ওমরাহদের অনেকেই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছেন মোতাজিলা সম্প্রদায়ের আকিদা বিশ্বাস দ্বারা। তার উপর আছে আলেম ও সুফী নামধারী চাটুকারের দল। এ অবস্থার জন্য কিন্তু আলেম ও ভণ্ড পীরদেরকেই সবচেয়ে বড় অপরাধী মনে হলো হজরত আবদুল কাদেরের। এদের দৃঢ়তার অভাবেই তো প্রশাসন পেয়েছে ধর্মহীনতা এবং ধর্মবিকৃতির অবাধ সুযোগ। পেয়েছে শরীয়তের কানুনের প্রতি অশ্রদ্ধা করবার প্রতিরোধহীন মানসিকতা।

তিনি তাদেরকে হুশিয়ার করে দিলেন-

'হে এলেম ও আমলের খেয়ানতকারীগণ। তাদের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? আমির ওমরাদের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি? হে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের দুশমন। হে দস্যুদল। তোমরা জুলুম এবং অপবিত্রতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছো। এ অবস্থা কতোদিন চলবে আর? হে পোশাক সর্বস্ব দরবেশ দল। বাদশাহদের মন তুষ্ট করবার জন্য তোমরা কতোদিন আর যাপন করবে মোনাফেকের জীবন। দুনিয়ার ধনসম্পদ আর ভোগবিলাসের উপকরণ অর্জনের প্রতিযোগিতায় কতোদিন কাটাবে আর? তোমরা এবং এই জামানার অধিকাংশ বাদশাহ্গণ জালেম ও খেয়ানতকারী প্রমাণিত হয়েছে। ইয়া আল্লাহ্। তুমি এই সমস্ত মোনাফেকদেরকে অপদস্থ করো। তাদের মর্যাদা নিশ্চিহ্ন করো তুমি। তাদেরকে তুমি তওবা নছিব করো। সংশোধন হবার সুযোগ প্রদান করো।'

ক্রমে ক্রমে আমির ওমারাহ্ আলেম মাশায়েখ সাধারণ মানুষ সবাই আলোকিত হতে শুরু করলেন হজরতের সূর্যের মতো ব্যক্তিত্বের এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষণের আলোকে। সমাজদেহের স্থবিরতায় এলো উজ্জীবনের নতুন অয়ন।

শুধু মুসলমান নয়– তাঁর রূহানী ক্ষমতা দ্বারা প্রাভাবান্বিত হলেন অনেক বিধর্মীও। প্রায় প্রতি ওয়াজের মজলিশে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁর মাধ্যমে গ্রহণ করতেন সত্য দ্বীন, ইসলাম।

একবার একজন ইয়েমেনবাসী খৃষ্টান তাঁর ওয়াজের মসলিশে হাজির হয়ে তাঁর হাতে মুসলমান হলেন। তারপর প্রকাশ্য সভায় তিনি তাঁর এস্থানে আসার কারণ জানিয়ে দিলেন সবাইকে। বললেন, 'আমি যখন মনস্থ করলাম ইসলাম গ্রহণ করবো, তখন এই আকাঙ্খাও করলাম যে, ইয়েমেনের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার এবং মোত্তাকী ব্যক্তির হাতে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, হজরত ইছা আ. হাজির হয়েছেন আমার কাছে। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি বাগদাদে গিয়ে আবদুল কাদেরের নিকট ইসলাম গ্রহণ করো। তিনিই বর্তমান জামানার সর্বোত্তম ব্যক্তি। সেই স্বপ্নের নির্দেশেই আজ আমি এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম।'

আর একবার হজরতের কাছে বায়াত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন তেরোজন খৃষ্টান। তারপর বললেন তাঁরা, 'আমরা আরবের খৃষ্টান। আমাদের মনকে আল্লাহ্পাক ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমরা স্থির করতে পারছিলাম না যে, কার হাতে আমরা বায়াত গ্রহণ করবো। ঠিক এমন সময় গায়েবী নির্দেশ শুনতে পেলাম আমরা, 'তোমরা বাগদাদে যাও এবং আবদুল কাদেরের নিকট বায়াত গ্রহণ করো। সেই গায়েবী নির্দেশের কারণেই আমরা শায়েখের এই দরবারে হাজির হতে সক্ষম হয়েছি।

কালের মহাসমুদ্রে মিশে যায় সময়ের স্রোতধারা। এ প্রবাহের বিরতি নেই। নীরবে নিরন্তর বয়ে চলে সময়ের স্রোত।

বছর গড়িয়ে যায়। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। হজরতের আহবান ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে। তিনি বিশেষভাবে গড়ে তোলেন সত্য দ্বীনের একদল বিশুদ্ধ

প্রচারক। তাঁর রূহানী শক্তির প্রভাবে তাঁরাও সূর্যের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের মতো করে গড়ে তোলেন নিজেদেরকে। সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়ে তাঁরাও আলো ছড়িয়ে দিতে থাকেন বিভিন্ন গ্রামে শহরে জনপদে।

ক্রমে ক্রমে হজরতের জামাতের হেদায়েতে আলো ছড়িয়ে পড়লো বোস্তাম, নিশাপুর, তাবরীজ, হামাদান, ইসপাহান, মোছেল, কেরমান, হলব, দামেশক, ইস্কানাদারিয়া, সিরাজ– আরো কতো কতো জায়গায়।

হজরত তার খলিফাগণকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত হবার জন্য সুদৃঢ় নির্দেশ দান করেন। তাঁর মোবারক সহবতের প্রভাবে তাঁদের মন মানসিকতাকে মুক্ত করেন লোভ লালসা কামনা বাসনার আবিলতা থেকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উন্নীত হন অতি উচ্চ রূহানী পদমর্যাদায়।

হজরত খলিফাগণকে এবং মুরিদগণকে উদ্দেশ্য করে নসিহত করেন–

‘আর যখন তোমাকে আশা আকাঙ্খার তাগাদা থেকে মুক্ত করা হবে, তখন তোমার নসিব হবে চিরস্থায়ী জীবন। যিনি তোমাকে অনুগ্রহ করে তোমার আশা আকাঙ্খার মৃত্যু ঘটিয়েছেন, তিনিই তোমাকে প্রদান করেছেন স্থায়ী জীবন। তিনি তোমাকে যে সম্পদে সম্পদশালী করেছেন তারপরে দারিদ্র আগমনের সুযোগ থাকবে না আর। তিনি তোমাকে যে নেয়ামত প্রদান করেছেন তারপর আর কোনোদিন আসবে না বঞ্চনার অভিশাপ। তখন তোমার সুখের পরে দুঃখ, অনুগ্রহের পরে নিগ্রহ, জ্ঞানের পরে অজ্ঞতা, মুক্তির পরে নিরাপত্তাহীনতা, পবিত্রতার পরে অপবিত্রতায় স্খলন, সম্মানের পর অসম্মান, নৈকট্যের পরে বিরহ, উন্নতির পরে অবনতি আর আসবে না কোনোদিন।

আঁধারের অধ্যায় শেষে যেমন উষার আগমন ঘটে তেমনি নিজেকে নিশ্চিহ্ন (ফানা) করবার পরেই আসে নিজের স্থায়িত্ব (বাকা)। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে যখন সাধক লাভ করে চিরস্থায়ী জীবন, তখন তুমি পাবে উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা। তখন তুমি হবে সিদ্ধপুরুষ। তখন তুমি স্বর্ণ প্রস্তুত করার লাল গন্ধকের মতো মূল্যবান হয়ে যাবে। তোমার দর্শন লাভ দুর্লভ হয়ে পড়বে তখন। তুমি হয়ে পড়বে অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয় গুণসম্পন্ন। তুমি হবে নবী, রসূল এবং পুণ্যাত্মাগণের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

আধ্যাত্মিক সাধকদেরকে দশটি অভ্যাস আয়ত্তে রাখতে হয়। এসব সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করে দিলেন তাঁর মোবাল্লেগগণকে। তিনি বললেন–

প্রথমতঃ সালেক সত্য কিংবা মিথ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার নামে কখনো কসম করবে না। যখন এই অভ্যাস আয়ত্তাধীন হবে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তার প্রতি উন্মুক্ত করে দিবেন নূরের প্রবাহ। সে তখন লাভ করবে আধ্যাত্মিক পদোন্নতি, শক্তি ও সম্মান। হয়ে পড়বে সজ্জন সুহৃদ এবং

প্রতিবেশীদের নিকট সম্মানিত। তখন তাকে যে চিনতে পারবে, সেই ব্যক্তি অনুসারী হবে তার এবং সবাই সমীহ করবে তাকে।

দ্বিতীয়তঃ কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলবে না। এই অভ্যাস অর্জিত হলে তার জিহবায় সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই আর উচ্চারিত হবে না। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তার বক্ষ প্রশস্ত করে দিবেন এবং তাঁর জ্ঞান হবে পরিচ্ছন্ন। মিথ্যা কি জিনিষ তা বুঝতেও তখন কষ্ট হবে তাঁর। মিথ্যুককে দেখলে মনে আসবে তখন ঘৃণা এবং অন্তর থেকে সে নিন্দা করবে মিথ্যাচারের। তখন সে যদি ঐ মিথ্যুকের মিথ্যাভ্যাস দূর করার জন্য দোয়া করে, তবে পাবে অনেক ছওয়াব।

তৃতীয়তঃ সাধক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না কোনোদিনও। বরং প্রতিশ্রুতি করাটাকেই এড়িয়ে চলবে। এইরূপ অভ্যাস হয়ে গেলে আল্লাহ্‌পাক তাঁর জন্য দান ও শালীনতার দুয়ার দিবেন খুলে। সালেহ ব্যক্তিগণের মধ্যে তার জন্য সঞ্চিত হবে ভালোবাসা। আল্লাহ্‌পাকের নিকটও বেড়ে যাবে তাঁর মর্যাদা।

চতুর্থতঃ সাধক সৃষ্টির প্রতি কখনো লানত (অভিসম্পাত) করবে না। কাউকে কষ্ট দিবে না। এ অভ্যাস 'সিদ্দীকিন' শ্রেণীভুক্ত অলিআল্লাহ্‌গণের অভ্যাস। এই অভ্যাসের ফলে লাভ হবে আখেরাতের কল্যাণ এবং দুনিয়ায় হেফাজত। ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা, উচ্চ মর্যাদা লাভ এবং সংসারের বিপদ থেকে মুক্তি লাভ হবে তাঁর। মানুষের মধ্যে সে হবে সকলের প্রিয় এবং আল্লাহ্‌পাকের নিকট পাবে তাঁর খাছ বেলায়েত (বিশেষ নৈকট্য)।

পঞ্চমতঃ সাধক কাকেও অভিসম্পাত দিতে পারবে না। যদি কেউ তার প্রতি জুলুম করে– তবুও তার প্রতি কটুক্তি উচ্চারণ করবে না এবং প্রতিশোধও গহণ করবে না সে। এই অভ্যাস তাকে এনে দিবে উন্নততর মর্যাদা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভূত সম্মান। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে। আপনপর সবারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভালোবাসা লাভ করবে সে।

ষষ্ঠ অভ্যাস হচ্ছে এইঃ সে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে শিরিক, কুফর অথবা মোনফেকীর অভিযোগ করবে না। এইরূপ স্বভাব আল্লাহ্‌পাকের রহমতের নিকটবর্তী। এ হচ্ছে উন্নত আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা। হজরত স. এর সমুজ্জ্বল সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ। এই অভ্যাস হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে প্রবেশের অভিজাত ও সম্মানিত সিংহদ্বার। এই অভ্যাসের ফলে সাধক পায় আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহের সহজ উত্তরাধিকার।

সপ্তম অভ্যাস হচ্ছেঃ প্রকাশ্য এবং অন্তরালবর্তী পাপাচার থেকে দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সুরক্ষিত রাখা। এর ফলে পুণ্য কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হতে পারে। দুনিয়াতেও শুভ ফল এবং আখেরাতেও উত্তম প্রতিদান এবং সমস্ত নেয়ামতে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোবৃত্তি পাওয়া যায় এই অভ্যাসের ফলে। আল্লাহ্‌পাক এ সমস্ত নসিব করুন আমাদেরকে।

অষ্টম অভ্যাসে অন্যের উপরে নিজের বোঝা চাপানোর মানসিকতা পরিহার করতে হয়। কেউ যেনো তার প্রতি অবনত হতে বাধ্য না হয়। এইরূপ স্বভাবের ফলে আল্লাহ্পাকের বান্দাগণের মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে নেক কাজে নির্দেশ এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের শক্তি অর্জিত হয়। এই অভ্যাসের কারণে সাধকের দৃষ্টিতে ছোট বড় সকলে সমান বিবেচিত হবে। সে তখন নিজের তরফ থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকবে।

নবমতঃ সাধক মানুষের প্রতি অনাবশ্যক আগ্রহ থেকে মুক্ত থাকবে। ফলে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতিই থাকবে তাঁর নির্ভরতা ও আগ্রহ। তখন তাঁর অর্জিত হবে শুদ্ধাচার। অর্জিত হবে দাসত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ।

দশমতঃ সাধক হবে বিনয়ী। বিনয়ের ফলে সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থান দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। বিনয়ী সাধক সুখে দুঃখে সব সময় আল্লাহ্পাকের সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে অর্জিত হয় তাকওয়ার (ধর্মভীরুতার) চরমতম সাফল্য। বিনয়ী ব্যক্তি কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তার সম্পর্কে মনে মনে ধারণা রাখবে, 'নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি আমার চেয়ে উত্তম।' যদি সে ব্যক্তি কম বয়সী হয়, তাহলে বলবে, কম বয়সের কারণে সে আমার চেয়ে পাপও করেছে কম।' আর বয়োজ্যেষ্ঠ হলে বলবে, 'বয়সে প্রবীন হওয়ায় তাঁর পুণ্য অর্জনের সুযোগও হয়েছে আমার চেয়ে বেশী।' যদি ঐ লোকটি জ্ঞানী হয় তবে বলবে, ইনি যা জানেন আমি তার সবকিছু জানি না। ইনি যা পেয়েছেন তা আমি পাইনি।' আর ঐ লোকটি তো অজ্ঞতার কারণে ভুলত্রুটি করেছে। আর আমি জেনে বুঝে ক্রমাগত করে যাচ্ছি পাপ। তাছাড়া আমিতো জানিও না যে, শেষ অবস্থা কার উত্তম হবে। আমার না তার? লোকটি যদি অবিশ্বাসী হয় তবে বলবে, 'সে ইমান গ্রহণ করবে কিনা তাতো জানি না আমি। আর একথাও জানি না যে, মৃত্যুর সময় আমি ইমান রাখতে পারবো কিনা শেষ পর্যন্ত।'

অভ্যাসের এই পর্যায় মানুষ নিজের শুভসমাপ্তির ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত এবং অপরের প্রতি উদার ও মহান হবার শিক্ষা দেয়। এই অভ্যাসে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্পাক শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ রাখেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন অন্যদের জন্যে আদর্শ হিসাবে। তখন সে আল্লাহ্তায়ালার নিষ্পাপ দোস্তগণের দলভুক্ত হয়। অহংকারের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে তখন।

আধ্যাত্মিক সাধকগণের জন্য এই পর্যায় হচ্ছে মর্যাদার চরমতম পর্যায়। এর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।'

মুরিদ ও খলিফাগণের মতো হজরত আবদুল কাদের তাঁর নিজের সন্তান সন্ততিদেরকেও গড়ে তুললেন দ্বীনের প্রকৃত সৈনিকরূপে। তাঁদেরকেও তিনি দিলেন কঠোর সাধনায় ব্রতী হবার সবক। বললেন।

‘আমি তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করবে। তাঁর ইবাদত করবে। শরীয়তের প্রকাশ্য দায়িত্বসমূহ পালন করবে। অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখবে। প্রবৃত্তিকে শিক্ষা দিবে প্রকৃত বীরত্ব। মুখমণ্ডল প্রশান্ত রাখবে। উত্তম সামগ্রী দান করবে। কাউকে কষ্ট দিবে না। অপরে কষ্ট দিলে তা সহ্য করবে। দারিদ্রতায় দৃঢ়চিত্ত থাকবে। প্রবীণদের মর্যাদা রক্ষা করবে। ভাই বোনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। ছোটদেরকে সদুপদেশ প্রদান করবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবে। পরার্থপরতায় একনিষ্ঠ হবে। সম্পদ জমা করবার অভ্যাস পরিত্যাগ করবে। যে তোমার আধ্যাত্মিক পথের পথিক নয়, তার সংসর্গে উপস্থিত হবে না। সৎকাজে সাহায্য করবে মানুষকে।

ফকিরির মূলতত্ত্ব হলো এই– তুমি তোমার মতো আর একজন থেকে বিমুখ হবে। মুখ ফিরাবে শুধু আল্লাহ্‌পাকের দিবে। আর স্বাচ্ছন্দ্যের মর্ম হলো, তোমার মতো অন্য কারো মুখাপেক্ষিতা থেকে নির্লিপ্ত হওয়া।

শুধুমাত্র বাক্যালাপে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় না। একদিকে ক্ষুধা, অপরদিকে লোভনীয় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায় এই।

তোমরা কোনো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষার্থীর নিকট থেকে প্রথমাবস্থাতেই জ্ঞানের প্রত্যাশা করো না। শিক্ষার্থীর নিকট আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রথমাবস্থায় থাকে অনাকর্ষণীয়। নম্র ও সহযোগীর মনোভাব দেখলে ধীরে ধীরে তার মনে সৃষ্টি হবে এই জ্ঞান অর্জনের প্রবল আগ্রহ।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান আটটি বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছে (১) হজরত ইব্রাহিম আ. এর মতো ত্যাগ (২) হজরত ইসমাইল আ. এর মতো সৎ সহযোগীতা (৩) হজরত আইয়ুব আ. এর মতো সহনশীলতা (৪) হজরত জাকারিয়া আ. এর মতো গোপন প্রার্থনা (৫) হজরত ইয়াহিয়া আ. এর মতো অস্বচ্ছলতা (৬) হজরত মুসা আ. এর মতো ছিন্ন পরিচ্ছদ (৭) হজরত ইসা আ. এর মতো অনিশ্চিত জীবনযাপন এবং (৮) হজরত মোহাম্মদ স. এর মতো দারিদ্র।

অবশেষে সেই দিন এলো। সেই যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করলেন হজরত আবুদল কাদের, যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী মাশায়েখগণ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। যে

উক্তির অনুরণন কালের প্রবাহে আজো উচ্চকিত। মানুষের স্মৃতির পটে আজো যা অক্ষয় শিলালিপির মতো উৎখীর্ণ হয়ে আছে।

আল্লাহ্‌পাক যাঁকে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সম্মানিত। আল্লাহ্‌পাক যাঁকে মর্যাদা প্রদান করেন, তিনিই মর্যাদাবান। আল্লাহ্‌পাক যাঁকে নেয়ামত প্রদান করেন, তিনিই সম্পদশালী।

'ওয়া আম্মা বি নিয়মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস' (তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামত সমূহ প্রকাশ করো)।

এই নির্দেশানুযায়ী নবী আ.গণ তাঁদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করেন নিজ মুখে। কারণ, নবীগণের তুল্য জ্ঞানসম্পন্ন এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় থাকেন অনুপস্থিত। তাই তাঁদেরকে নিজ মুখেই বর্ণনা করতে হয় নিজেদের মর্যাদার কথা নবুয়তের ক্ষেত্রে এটা সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু বেলায়েতের ক্ষেত্রে এটা সাধারণ নিয়ম নয়। কারণ তাঁদের সমমর্যাদাসম্পন্ন আরো অনেক অলিআল্লাহ্ উপস্থিত থাকেন তাঁদের সমসাময়িক জামানায়। তাই নিজের মুখে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করানো তাঁদের জন্য শোভনীয় নয়। বেলায়েতের ক্ষেত্রে এটাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম মেনেও চলেন অলিআল্লাহ্‌গণ।

কিন্তু প্রত্যেক সাধারণ নিয়মের কিছু না কিছু ব্যতিক্রমও থাকে। তাই বেলায়েতের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো এ নিয়তের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়।

বেলায়েতের পদমর্যাদা মত্ততাসম্ভূত। নবীগণের মতো পূর্ণ সজ্ঞাসম্পন্ন নন অলিআল্লাহ্‌গণ। কখনো কখনো মত্ততা আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাঁরা। তখন নিজের মর্যাদা প্রসঙ্গে তাঁদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় নিজেরই কৃতিত্বমূলক কিছু উক্তি যা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশযোগ্য নয়। অথচ মত্ততার কারণে তাঁরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি নিজেদেরকে। আর একটি কারণে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সজ্ঞান অবস্থাতেও বর্ণনা দেন তাঁরা। যখন বর্ণিত মর্যাদার প্রসঙ্গ এমন অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী হয়, যা তিনি নিজে না বললে তা বুঝবার এবং বলবার মতো জ্ঞানধারী কেউ বর্তমান থাকেন না। সে সময় 'তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতসমূহ বর্ণনা কর' আল্লাহ্‌পাকের এই নির্দেশানুযায়ী সুন্নতের হক আদায় করবার জন্য তাঁরা নিজ মুখে উচ্চারণ করেন তাঁদের অসাধারণ বুজর্গির সংবাদ। অবশ্য এই উম্মতের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক অলিআল্লাহ্‌গণের জীবনে এরকম ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে।

হলব নামক স্থানে ছিলো হজরতের একটি মেহমানখানা।

সেদিন মেহমানখানায় হাজির ছিলেন তিনি। মেহমানদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করেছিলেন হজরত। তার ওয়াজের নূরে ভরপুর ছিলো গোটা মহফিল। যেনো

বেহেশতি শরাবান তহুরায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন সবাই। হঠাৎ উচ্চারণ করলেন তিনি, 'সমস্ত অলি আল্লাহ্গণের গর্দানে আমার কদম।'

মুহূর্তে অপার্থিব গাম্ভীর্যে স্তব্ধ হয়ে গেলো সারা মজলিশ। পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে মজলিশে উপস্থিত আউলিয়াগণ সবাই স্বীকার করে নিলেন হজরতের দাবী। তারপর প্রকাশ্যে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন হজরতকে।

একে একে তাঁরা হাজির হলেন হজরতের সামনে এবং তাঁর মোবারক কদম স্পর্শ করলেন নিজেদের স্কন্ধদেশে।

'সকল আউলিয়ার ঘারে আমার কদম' হজরতের এই ঘোষণা শুধু এই মজলিশে সীমাবদ্ধ রইলো না। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর গুঞ্জন। সারা পৃথিবীর অলিআল্লাহ্গণ তাঁদের নিজ স্থানে বসে শুনতে পেলেন হজরতের ঘোষণা। তাঁদের সংখ্যা মোট ৩১৩ জন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই হজরতের কদমের উদ্দেশ্যে ঝুকিয়ে দিলেন নিজেদের গর্দান।

মক্কা-মদীনা শরীফের ১৭ জন, ইরাকের ৭০ জন। আজমে ৪০ জন, শামে ৩০ জন, মিসরে ২০ জন, মাগরেবে ২৭ জন, হাবশায় ১১জন, ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এলাকায় ৭ জন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলের ৩৪ জন, কোহেকাফে ৫০ জন এবং সরন্দীপে ৭ জন।

এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। সবাই স্বীকার করে নিলেন তাঁর এই মহামর্যাদার অধিকার। হজরত আবদুল কাদের এখন শুধু পীর নন। পীরদের পীর। পীরশ্রেষ্ঠ। বড়পীর। হজরত বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী র.।

হজরত বড়পীর র. ছিলেন সৌম্যকান্তি সুদর্শন পুরুষ। তাঁর শরীরের রং ছিলো উজ্জ্বল। মাধ্যমাকৃতির ছিলেন তিনি। বক্ষ ছিলো প্রশস্ত। শরীর কৃশকায় হলেও তাঁর সমস্ত অবয়বে ছিলো প্রখর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তি। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, সুস্পষ্ট ও সুমধুর। প্রশান্ত ললাট। ক্ষীণ ভ্রুরেখা সংলগ্ন। দাড়ি মোবারক অত্যন্ত ঘন। স্বভাব গাম্ভীর্যমণ্ডিত। নীরবতা ও নির্জনতা ভালবাসতেন তিনি। অনাবশ্যক কার্যকলাপে তিনি কখনো লিপ্ত হতেন না। আল্লাহ্তায়ালার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে মোরাকাবার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করতে পছন্দ করতেন তিনি।

'গাউস' আধ্যাত্মিক জগতের এক মহাসম্মানিত পদমর্যাদা। বড়পীর র. শুধু গাউস ছিলেন না। ছিলেন গাউসশ্রেষ্ঠ। গাউসুল আজম।

তিনি ছিলেন মুহিউদ্দিন। দ্বীনের পুনর্জীবনদানকারী। তাঁর তেজদীপ্ত সূর্যের মতো আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়ে উঠেছিলো তামাম মুসলিম জাহান। শুধু ইরাক নয়, সমস্ত পৃথিবীই পেয়েছিলো গাউসুল আজমের হেদায়েতের কিরণ। হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশের দিকে ছুটে এসেছিলেন তাঁর খলিফাগণ, তাঁরই রূহানী নূরের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে। তাঁরাও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করেছিলেন গাউসুল আজমের ফয়েজের অন্তহীন জ্যোতিধারা।

হজরত বড়পীর র. এর খলিফাগণ ছিলেন তাঁরই মতো কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত। তাঁরই মতো এলেমের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পারদর্শী। প্রতিকূল পরিবেশে তারা নত হতেন না কখনো। মানব কল্যাণে তারাও কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁদের জীবনের সমস্ত সময়।

আকায়েদের ক্ষেত্রে হজরত বড়পীর র. ছিলেন ইমাম মাতুরিদি সম্প্রদায়ের আকিদায় বিশ্বাসী। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের কাঠামো ছিলো সরলতার সৌন্দর্যমণ্ডিত। দার্শনিক জটিলতা, অনাবশ্যক বিতর্কপ্রীতি থেকে এই সম্প্রদায় পরহেজ করতেন। তাই দেখা যায় বেশীর ভাগ অলিআল্লাহ্গণ এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস পছন্দ করেন।

তাঁর মজহাব ছিলো হাম্বলী মজহাব। অবশ্য মজহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা র. এর মর্যাদা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। এক সময় তিনি হাম্বলী মজহাব পরিত্যাগ করে হানাফি মজহাব অবলম্বন করবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু একটি স্বপ্নের কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে পারেননি।

একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি রসূলেপাক স. এর সামনে হাজির হয়েছেন। তিনি দেখতে পেলেন, হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.ও সেখানে হাজির আছেন। তিনি রসুলেপাক স.কে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ। আপনার এই আওলাদ আমার মজহাব পরিত্যাগ করতে চায়।'

এই স্বপ্ন দেখবার পর হজরত বড়পীর র. তাঁর মজহাব পরিবর্তনের চিন্তা পরিত্যাগ করেছিলেন।

হজরতের দরবার ছিলো সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত। তাঁর উদারতায় মুসলমান অমুসলমান আমির ফকির সবাই ছিলেন মুগ্ধ। একজন আমির তাঁর দরবারে যেভাবে আপ্যায়িত হতেন একজন দরিদ্র ব্যক্তিও পেতেন সেরকমই আপ্যায়ন।

অনেক নিঃসম্বল পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতো বড়পীর র. এর সাহায্যের উপরে। তিনি নিজ অর্থে এতিম অভিভাবকহীন বালক বালিকা এবং অসহায় বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর নিজেরই অর্থে সুসম্পন্ন হতো সে সমস্ত বিবাহ।

হজরত ছিলেন ত্যাগের মহান আদর্শ। সত্য কথা বলার ব্যাপারে তিনি কারো পরোয়া করতেন না। অনুকূল প্রতিকূল সর্ব অবস্থায় তিনি ছিলেন তাঁর নিজ সংকল্পে অটল। আমানতদারীর ব্যাপারে তাঁর সুখ্যাতি ছিলো প্রচুর।

আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন তিনি। তাঁর অন্তর ছিলো নবীয়ে পাক স. এর মহব্বতে পরিপূর্ণ। সত্যনিষ্ঠা, পরহেজগারী, দানশীলতা এবং আত্মনির্ভরতা ছিলো তার অঙ্গের ভূষণ।

হজরত বড় পীর র. ছিলেন মহানুভব এবং প্রশান্তচিত্তের অধিকারী। কর্কশ বা অশ্লীল বাক্য কখনো উচ্চারিত হতো না তাঁর মুখ দিয়ে। তাঁর সামনেও কেউ অশ্লীল ও অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা করতে সাহস পেতো না। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সুন্দর স্বভাব এবং রূহানী শক্তির প্রভাবে ফাছেক, বেদাতী এবং উচ্ছৃঙ্খল লোকজন ছুটে আসতো তাঁর কাছে। অমুসলমান সম্প্রদায়ও ছুটে আসতো তাঁর কাছে। সবাই তওবা করতো। ফিরে পেতো প্রকৃত পথের নিশানা। দরবারে তাঁর ভীড় লেগেই থাকতো সব সময়।

হজরতের মন ছিলো কুসুমের মতো কোমল। দুনিয়ার প্রতি কণা পরিমাণ আকর্ষণও অবশিষ্ট ছিলো না তাঁর অন্তরে। লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অহমিকা– সমস্ত প্রকার অসৎগুণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন তিনি।

তিনি ছিলেন বেলায়েতের বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু সদৃশ। সে সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিলো বেলায়েতের কক্ষপথের অসংখ্য কামেল অলিআল্লাহ্। বেলায়েতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের মধ্যমণি হিসাবে তিনি ছিলেন জ্বলন্ত সূর্যের মতো ভাস্বর।

রসূলেপাক স. এর মতো তিনিও সংসার জীবনের মধ্যে থেকেই করেছিলেন দ্বীনের প্রচার প্রসার প্রতিষ্ঠার কাজ। সংসার-ত্যাগী অলি আল্লাহ্‌গণের পথ তিনি বেছে নেননি। কারণ, তিনি জানতেন সর্ববিষয়ে রসূলেপাক স. এর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে দুই জাহানের পূর্ণতা ও সফলতা।

চারজন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন হজরত বড় পীর র.। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে সন্তান সন্ততি দান করেছিলেন অনেক। মোট ৪৯ জন ছেলেমেয়ে ছিলো তাঁর। তাঁর মধ্যে ২০ জন ছিলেন পুত্র।

তাঁর পুত্রগণও ছিলেন কমবেশী তাঁদের পিতার মতোই জ্ঞানী ও নেক স্বভাবসম্পন্ন। তাঁদের কেউ কেউ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন প্রচুর।

তিনি ছিলেন সম্মানিত সৈয়দ বংশদ্ভূত। পিতা মাতা উভয় দিকেই তিনি ছিলেন রসূলেপাক স. এর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পিতার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন ইমাম হাসান রা. এবং মাতার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন হযরত ইমাম হোসেন রা. এর বংশধর। তাই তিনি ছিলেন একাধারে হাসানী ও হোসায়নী সৈয়দ।

হজরত বড় পীর র. সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন। অজু ভঙ্গ হলে সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় অজু করতেন এবং দুই রাকাত তাহইয়াতুল অজুর নামাজ পড়তেন।

তিনি রাত্রিবেলা প্রায় সমস্ত রাত্রিই একপায়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে কাটিয়ে দিতেন। কখনো নামাজ পড়তেন। কখনো নামাজের এক সেজদাতেই তাঁর অতিবাহিত হতো কয়েক ঘন্টা সময়। রাত্রি অবশিষ্ট থাকলে বাকী রাত কাটিয়ে দিতেন জিকির, মোরাকাবা ও ক্রন্দনের মাধ্যমে।

কঠোর রেয়াজত, মোশাহেদা এবং দ্বীনের প্রসারের জন্য এতো পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে মনে করতেন দীন হীন নগণ্যাতিনগণ্য। আখেরাতের আজাবের ভয়ে কেঁদে আকুল হতেন তিনি। সমস্ত রাত্রি তাঁর কাটতো নির্ঘুম। দিন রাতের কোনো মুহূর্তই তিনি ইবাদত ব্যতিরেকে ব্যয় করতেন না। তিনি বলতেন, 'ইন্না সলাতি ওয়া নুছুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন' (আমার নামাজ, আমার কোরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য– যিনি প্রতিপালক সমগ্র বিশ্বের)।

হজরত বড় পীর র. বলতেন, 'আমি আমার আমলের মধ্যে ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের মতো উত্তম কিছু পাইনি। যদি সারা দুনিয়ার সম্পদ আমার অধিকারে থাকতো, তবে সে সম্পদের দ্বারা আমি শুধু ক্ষুধার্তকে আহার্য বস্তু দান করতাম।' তিনি এরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন যে, যদি সকালে তাঁর হাতে হাজার দীনার আসতো তবে দিন শেষে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না আর।

হজরত উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। যখন নতুন পোশাক পরতেন, তখন ব্যবহৃত পোশাক কাউকে দান করে দিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছিলো তাঁর প্রিয় বস্তু। তিনি সুগন্ধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেক জুমআর দিন তিনি পোশাক ও জুতা পরিবর্তন করতেন। সাধারণতঃ তাঁর পথ চলার বাহন ছিলো খচ্চর। পথ অতিক্রমণের সময় মানুষ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতো। ভীড় জমে যেতো মানুষের তাঁকে কেন্দ্র করে।

সাধারণ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন হজরত। তাঁর নিজ অর্থ ব্যয়ে, তাঁর জন্য আলাদাভাবে ফসল উৎপন্ন করানো হতো। ঐ ফসলের প্রস্তুতকৃত চার পাঁচটি রুটি তাঁর নিকট হাজির করা হতো সন্ধ্যার পূর্বে। তিনি ঐ রুটি থেকে মিছকিনদেরকে দান

করতেন। তারপর যা অবশিষ্ট থাকতো তাই খেতেন তৃপ্তির সঙ্গে। তাঁর আহারের পরিমাণও ছিলো কম। গোশত, ঘি, দুধ খুব কম সময়ই আহার করতেন। অধিকাংশ সময় সমস্ত দিনে রাত্রে মাত্র একবার আহার করতেন তিনি।

সংসারের ছোটো খাট কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন হজরত। নিজে বাজারে গিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আনতেন। সঙ্গী সাথীসহ কোথাও সফরে গেলে নিজ হাতে সবার জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন তিনি। নিজ হাতে আটা মাখতেন। রুটি প্রস্তুত করতেন। তারপর সকলকে পরিবেশন করতেন খাদ্যসামগ্রী। সঙ্গীসাথীরা আপত্তি রাখলে তিনি বলতেন, 'আমিতো তোমাদেরই মতো মানুষ।'

তার বিবি সাহেবাগণ সংসারের কাজ গোছাতে অসমর্থ হলে তিনি সংসারের সমস্ত ভার নিজে হাতে তুলে নিতেন। তখন ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাসন কোসন পরিষ্কার করা, রান্না বান্না করা, কুয়া থেকে পানি আনা– সবই করতে হতো তাঁকে।

তিনি তাঁর সন্তানদের নিকট ছিলেন স্নেহময় পিতা। স্ত্রীগণের নিকট প্রেমময় স্বামী। প্রতিবেশীগণের কাছে আত্মীয়ের মতো আপন। অভাবগ্রস্তদের নিকট মুক্তহস্ত অকৃপণ বন্ধু।

তিনি অসাধারণ ছিলেন বলেই সাধারণ মানুষের এতো কাছাকাছি ছিলো তাঁর অবস্থান। তিনি পূর্ণ ছিলেন বলেই অপূর্ণ মানুষের জন্য তাঁর ছিলো সীমাহীন দরদ। আখেরী পয়গম্বর স. এর স্বভাব চরিত্রের নূরে তিনি পূর্ণ নূরময় ছিলেন বলেই তাঁর চিন্তা চেতনায়, কথায় কাজে অভিব্যক্তিতে, স্বভাব চরিত্রে ফুটে উঠতো আখেরী নবী র. এর মতো অনন্যসাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

মুফতীর দায়িত্বও পালন করতেন হজরত। ফতোয়া দিতেন তিনি হাম্বলী মজহাবের মতানুযায়ী।

আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য দুনিয়ায় পাঠান। তাঁরা আল্লাহ্পাকের জ্ঞানে জ্ঞানী, আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান এবং আল্লাহ্র সাহায্যে সাহায্যপ্রাপ্ত বলে তাঁদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা সম্পাদন করেন সফলভাবে।

হজরত বড়পীর র.ও তাঁর উপরে অর্পিত দায়িত্ব তেমনি সম্পাদন করেছিলেন সুষ্ঠুভাবে। তিনি ছিলেন পীরশ্রেষ্ঠ। তাই শুধু মুরিদ নয়, পীরদেরকেও তিনি পরিচালিত করেছিলেন এক সুনিয়ন্ত্রিত কর্মসূচীর মাধ্যমে।

তিনিই প্রথম তরিকাকে রূপ দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানিকভাবে। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এমন তরিকা, যার কর্মী হিসাবে হাজার হাজার আউলিয়া নিজেদেরকে পরিচিত করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকার নাম তরিকায়ে আলিয়া কাদেরিয়া। এই তরিকার মাধ্যমে তিনি সংগঠিত করেছিলেন দ্বীনের এক বিরাট প্রচারক দল। তাঁর মৃত্যুর পরও এই সুউচ্চ সিলসিলার পরবর্তী খলিফাগণ শত শত বছর ধরে দিয়েছিলেন দ্বীনি খেদমতের আনজাম। দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে তাঁর তরিকাই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

কিছুলোক অজ্ঞতাবশতঃ বলে থাকেন, তরিকা হচ্ছে বেদাত। তাঁদের স্থূল দৃষ্টিতে তরিকার সঠিক অর্থ ধরা পড়ে না বলে তাঁরা এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি করে থাকেন।

রসূলেপাক স. এরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক বেদাত গোমরাহী (পথ ভ্রষ্টতা)।'

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সোজাসুজি বলে থাকেন, যেহেতু রসূলেপাক স. ও তাঁর সাহাবাগণের আমলে তরিকা ছিলো না, সেহেতু তরিকা বেদাত অর্থাৎ নতুন সৃষ্ট বস্তু।

একটু গভীরভাবে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে সহজেই এই ভ্রান্তির অপনোদন হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি আক্রান্ত ব্যক্তির মূল উদ্দেশ্যতো প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা। প্রকৃত জ্ঞানানুসন্ধান নয়। প্রকৃত পথ অনুসন্ধান তো নয়ই।

হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য এলেম শিক্ষা করা ফরজ।'

আবার একথাও উল্লেখ করা হয়েছে হাদিস শরীফে যে, 'এলেম দুই প্রকার। এক প্রকার জবানী এলেম এবং অপর প্রকার কলবী এলেম।'

এই দুইখানি হাদিস বিশ্লেষণ করে অতি সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, এলেম শিক্ষা করা ফরজ। এলেম দুই রকম। তাই দুই রকম এলেম শিক্ষা করাই ফরজ। যেহেতু হাদিস শরীফে শুধু জবানী এলেম শিক্ষা করাকে ফরজ বলা হয়নি। অথবা একথাও বলা হয়নি যে, শুধুমাত্র কলবী এলেম শিক্ষা করা ফরজ। তাই এলেম যেহেতু দুই রকম আর এলেম যেহেতু শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ– তাই দুই রকম এলেমই শিখতে হবে সবাইকে।

জবানী এলেম হচ্ছে– শরীয়তের হুকুম এবং নিষেধ সম্পর্কীয় জ্ঞান। যেমন ফরজ, ওয়াজেব, হালাল, হারাম ইত্যাদি এবং এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে– এই এলেমের সাহায্যে মানুষের নিজেদের বাহ্যিক শরীর এবং তাদের জীবনযাত্রার

বাহ্যিক কর্মপ্রণালীকে শরীয়তের আওতায় নিয়ন্ত্রিত করা। আর কলবী এলেমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে করে এই এলেমের সাহায্যে মানুষ তার কলবকে (অন্ত র্জগতকে) শরীয়তের সাজে সজ্জিত করতে পারে।

মানুষের শরীরের নাপাকি দূর করবার জন্য যেমন শরীয়তে অজু গোসলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন মানুষের ইবাদত বন্দেগী ক্রয় বিক্রয় আচার বিচার করবার জন্য শরীয়তের আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইন প্রতিষ্ঠিত না হলে যেমন মানুষের শারিরীক ইবাদত বন্দেগী এবং তাঁর ব্যবহারিক জীবন যাত্রা অপবিত্র হয়ে পড়ে, তেমনি মানুষের অন্তর্জগতকেও পবিত্র করবার শিক্ষাও বর্ণিত হয়েছে শরীয়তে। নামাজে আলস্য, জাকাতে গড়িমসি, ওজনে কম দেওয়া, জুলুম অবিচার যেমন শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ তেমনি অন্তরে অহমিকা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতাবোধ, শঠতার অনুভূতি অন্তরে বিদ্যমান রাখা, নামাজের সময় গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হওয়াও শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। বাহ্যিক ময়লা ধুয়ে ফেলে মানুষের শরীরকে যেমন পবিত্র করতে হয়, রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করে যেমন সমাজের অন্যায় অনাচার রোধ করতে হয়, তেমনি কলবকে (অন্তরকে) পবিত্র করতে গেলে জেনে নিতে হয় কলবী এলেম।

হাদিস শরীফে এই কলবী এলেমকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশী। বলা হয়েছে ‘ফাজালিকাল ইলমুন নাফিউ’– ইহাই উপকারী এলেম। সহজভাবে আমরাও বুঝতে পারি একথা যে, কলব হচ্ছে ভালো মন্দ উভয় প্রকার কাজের পরিকল্পনাস্থল। মানুষের বাইরের পুণ্য অথবা পাপ তো কলবেরই চিন্তার ফল। যে কথা প্রথমে মনে (কলবে) উদয় হয় না, সে কথা বাস্তবে কেউই রূপ দিতে পারে না।

যে চুরি করে– চুরি করার পূর্বে চুরি করবার চিন্তা তার কলবেই উদয় হয় প্রথমে। যে নামাজ পড়ে– নামাজ পড়ার পূর্বে কলবেই খেয়াল হয় প্রথমে নামাজ পড়ার কথা। সুতরাং কলবের অবস্থা পর্যালোচনা করা, কলবের (অন্তরের) গতিবিধি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অতি আবশ্যকীয় কাজ। আর কলবের এই গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করবার জ্ঞান (কলবী এলেম) শিক্ষার জন্যই তাই জবানী এলেমের মতো বরং তার চেয়েও বেশী তাগিদ এসেছে।

আমরা জানি, যে ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে থাকে বিরাটকায় অট্টালিকা, যে মূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে বিশাল বৃক্ষ, তাদের ভিত্তি ও মূল দৃশ্যগোচর নয়। কিন্তু ভিত্তি ব্যতিরেকে অট্টালিকা, মূল ব্যতিরেকে বৃক্ষ কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? না পেতে পারে তাদের অস্তিত্ব? কিন্তু সব ব্যাপারে বুঝলেও দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের ধারণা হয়েছে খণ্ডিত, একপেশে, অসম্পূর্ণ। তাই অন্তরকে শরীয়তের আদেশ নিষেধ পালনের উপযোগী করে গড়বার যে এলেম (কলবী এলেম) আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী স.থ– তা অর্জন করবার ব্যাপারে আমরা গড়িমসি করি।

কলবী এলেম শিক্ষার প্রতি মানুষের এই অনীহার এবং বিরোধিতার কারণ কি, তাও আমাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

হাদিস শরীফে এসেছে, 'শয়তান মানুষের কলবে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। যে কলবে আল্লাহ্‌র জিকির হয়, সেখানে শয়তান থাকতে পারে না। আর যে কলব জিকির থেকে গাফেল থাকে, সে কলবে শয়তান অধিষ্ঠিত থাকে।'

কলবী এলেম শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলবে বিরতিহীনভাবে আল্লাহ্‌র জিকির প্রতিষ্ঠিত করা। এই জিকির বিরতিহীন না হলে বিস্মৃতির সময়ে শয়তান পুনরায় অধিষ্ঠিত হবে কলবে এবং কলবের (অন্তরের) ধারণা বিশ্বাসকে সে তার ইচ্ছামতো করবে পরিচালনা। জিকিরহীন কলব শয়তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে বলেই সে তার ইচ্ছামতো কলবে আমদানী করতে থাকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, অহংবোধ, হিংস্রতা, পরশ্রীকাতরতার ধারণা, নামাজের সময় অমনোযোগীতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই সমস্ত ধারণা আমাদের অন্তরে থাকা অবৈধ। এসব ধারণার লালনকারী শয়তানকে কলব থেকে উচ্ছেদ করবার জ্ঞানই হচ্ছে কলবী এলেম– যা শিক্ষা করা ফরজ। কলব আরশতুল্য। সেখানে আল্লাহ্‌র স্মরণ থাকা প্রয়োজন। শয়তানের নয়।

এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার যে, কলবী এলেম শিক্ষা করা শয়তানের খুবই অপছন্দ। বরং কলবী এলেম না শিখে একটা মানুষকে শরীয়তের বাহ্যিক আমলে আজীবন নিয়োজিত রাখতে পারলে শয়তান সন্তুষ্ট থাকে। তার নিজের ঘাঁটিতে হামলা না হলেই সে খুশী। এমতাবস্থায় একটা মানুষের সারা জীবনের এলেম আমল বরবাদ করে দিতে তার মুহূর্ত পরিমাণ সময়ও লাগবে না। মনে শুধু 'আমি অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এরকম ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই হলো। সারা জীবনের ইবাদত পণ্ড হয়ে যাবে এক মুহূর্তেই, যেমন তার নিজের (শয়তানের) লক্ষ লক্ষ বছরের ইবাদত পণ্ড হয়ে গিয়েছিলো শুধু মাত্র একটি কথায়। সে কথাটি হচ্ছে, 'আনা খায়রুম মিনহু' (আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ)।

এবার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, যারা কলবী এলেম শিক্ষায় আগ্রহী নয়, তাদের অনাগ্রহের মূলে এবং যারা এই এলেম শিক্ষার বিরোধিতা করে, তাদের বিরোধিতার মূলে রয়েছে শয়তান। তাদের উক্তি আসলে শয়তানেরই উক্তি– যা উচ্চারিত হচ্ছে তাদের মুখ দিয়ে।

দ্বীনের এলেম রসূলেপাক স. এর জামানায় রসূলেপাক স. এর সহবতের মাধ্যমে শিক্ষা করতেন সাহাবীগণ।

তখন জবানী এলেম শিক্ষার জন্য যেমন কোনো মাদ্রাসা ছিলো না তেমনি কলবী এলেম শিক্ষার জন্যও ছিলো না কলবী এলেমের কোনো মাদ্রাসা যাকে তরিকা বলা হয়। সাহাবা কেরাম রা. এর জামানার পর জবানী এলেমের বিশেষজ্ঞ যেমন, ফকীহ্ মুফাসসির, মুহাদ্দিসগণ ব্যক্তিগতভাবে এই এলেম শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে কলবী এলেম শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন গাউস, কুতুব, পীর আউলিয়াগণ। ক্রমে ক্রমে জবানী এলেমের এই বিক্ষিপ্ত শিক্ষা ধারাকে সুশৃংখল রূপ দেয়া হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান– মাদ্রাসা। আর সুশৃংখলভাবে কলবী এলেম শিক্ষার জন্যও প্রতিষ্ঠিত হলো কলবী এলেমের মাদ্রাসা– তরিকা। আর 'কাদেরিয়া তরিকা' হলো কলবী এলেমের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা।

এখন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে কারণে তরিকাকে বেদাত বলে, সে কারণে মাদ্রাসা শিক্ষাকেও তো বেদাত বলা উচিত। কারণ রসূলেপাক স. এর জামানায় তরিকা যেমন ছিলো না, তেমনি ছিলো না মাদ্রাসাও।

কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিদের মুখে 'মাদ্রাসা বেদাত' এ কথা উচ্চারিত হয় না। তারা বেদাত শব্দ ব্যবহার করতে আগ্রহী শুধু তরিকার বেলাতেই। এখানেও ঐ একই কারণ, যার মন্ত্রণাদাতা হচ্ছে শয়তান স্বয়ং। কারণ, মাদ্রাসায় এলেম শিক্ষা করলেও শয়তানের আপত্তি নেই। কিন্তু কলবের প্রতি যেনো নজর করা না হয়। কলবে আল্লাহ্পাকের জিকির জারী করবার জন্য যেনো শিক্ষা গ্রহণ না করা হয়।

যুগে যুগে দ্বীনের এলেমের এই দুই ধারাকে (জবানী এলেম এবং কলবী এলেম) বহন করে এনেছেন প্রকৃত আলেমগণ এবং খাঁটি সুফিগণ। আর একই সাথে যুগে যুগে এলেমের এই দুই ধারাকে বিকৃত করেছে অসৎ আলেমগণ এবং ভণ্ড সুফিগণ। এই সমস্ত অসৎ আলেম এবং ভণ্ড সুফিদের কবল থেকে দ্বীনের জ্ঞানার্জনের এই দুই প্রবাহকে মুক্ত করে একে প্রাণবন্ত করে তুলবার জন্য আবির্ভূত হন নবী পাক স. এর প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণ। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার (জবানী ও কলবী এলেম) কারণেই মানুষ যুগে যুগে আলোকিত হয়ে আসছে দ্বীনের আলোকে। ঐ সমস্ত মহাপুরুষগণের কাফেলায় হজরত বড় পীর র. ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ ইমাম। তাঁর মেহনতে সঞ্জীবিত হয়েছে দ্বীন। ইসলামের মৃতপ্রায় কাননে দল মেলে দিয়েছে রাশি রাশি পুষ্পের অপরূপ সৌন্দর্য সম্ভার। শত শত বছর পর আজো যার ঘ্রাণ সুবাসিত করে তোলে আশেকজনের অন্তরকে।

বাগদাদ তখন বহু অলিআল্লাহ্ মাশায়েখগণকে বুকে ধরে আছে। তাঁরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিয়ে যাচ্ছেন দ্বীনি খেদমতের সুষ্ঠু আঞ্জাম। কিন্তু গোটা মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক জীবনে যে ইসলামবিরোধী ধ্যান ধারণা এবং পাপাসক্তির বিরাট ধ্বস নেমেছে তা রোধ করবার মতো কেউ নেই। এককভাবে তো নয়ই বরং সম্মিলিতভাবেও মুসলিম মিল্লাতের এই পতন রোধ করা সম্ভব ছিলো না কারো পক্ষে। সমাজের সমস্ত স্তরে রাতের গাঢ় আঁধারের মতো বেদাত, কুসংস্কার ও বিলাসিতার প্রবণতা চেপে বসেছে মজবুতভাবে। এই আঁধার চন্দ্র নক্ষত্রের আবছা আলোয় দূর হয় না। এ আঁধার দূর করতে হলে প্রয়োজন তেজদীপ্ত সূর্যের।

বড়পীর র. সূর্যের মতোই উদিত হলেন জামানার আসমানে। তখন আঁধার গুটিয়ে ফেললো তার রাজ্যপাট। সমাজের সর্বস্তরে পড়ে গেলো প্রাণের সাড়া। সমসাময়িক মাশায়েখগণ সবাই স্বীকার করে নিয়ে ধন্য হলেন যে– বড়পীর র. দ্বীনের সংস্কারক। দ্বীনের পুনর্জীবনদানকারী। মুহিউদ্দিন।

স্বীকার করে নিলেন শায়েখ আলী বিন আল হাইতি র.। তিনি ছিলেন নিজ এলাকায় খুবই জনপ্রিয়। বড়পীর র. এর সঙ্গে তাঁর ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একান্ত বিনয়ী এই শায়েখ বড়পীরকে অত্যধিক সম্মান করতেন।

শায়েখ আলী বিন আল হাইতি বড়পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে গোসল করে নিতেন এবং সঙ্গী সাথীদেরকে বলতেন, 'শরীর পাক ছাফ করে নাও। মন থেকে সন্দেহ দূর করে ফেলো। মনে রেখো, আমরা সুলতানুল আউলিয়ার দরবারে রওয়ানা হচ্ছি।

তিনি বড়পীরের দরবারে পৌঁছে দরজার বাইরে দাঁড়াতেন প্রথমে। তারপর প্রবেশের অনুমতি কামনা করতেন। অনুমতি পেলে প্রবেশ করতেন দরবারে। হজরত বড়পীরের রূহানী প্রভাবে তিনি কাঁপতে শুরু করতেন।

একদিন তাঁর এই অবস্থা দেখে বড়পীর র. প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কেনো এমন করছেন।' শায়েখ বললেন, 'আপনার ভয়ে কাঁপছি। আপনি আউলিয়া সম্রাট। আপনি যদি অভয় দেন তবেই আমার অস্থিরতা দূর হতে পারে।'

হজরত বড়পীর র. বললেন, 'অভয় দিলাম। আপনার কোনো ভয় নেই।'

শায়েখ আবদুর রহমান তফুনজী র. ছিলেন আর একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অলিআল্লাহ্। বড়পীর র. এর প্রতি তাঁরও ভক্তি ছিলো অতি উচ্চ।

একবার তিনি জুমআর নামাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। খচ্চরের রেকাবে পা রাখতে যাচ্ছিলেন শায়েখ। সঙ্গে সঙ্গেই পা নামিয়ে নিলেন তিনি। এ অবস্থা দেখে তাঁর পুত্র এরূপ করবার কারণ জানতে চাইলে শায়েখ বললেন, এখন গাউসে আজম জুমআর নামাজে যাবার জন্য তাঁর বাহনে আরোহণ করছেন। তাঁর আগে সওয়ার হওয়াকে আমি আদবের খেলাপ মনে করি।'

শায়েখ তফুনজি ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর পুত্র শায়েখ আবুল হাসান আলী আল হাছনাইনকে অসিয়ত করে গেলেন, 'হজরত আবুদল কাদেরের আনুগত্য এবং সম্মান করার ব্যাপারে কখনো কোনোরূপ ত্রুটি যেনো না হয়।'

কঠোর ইবাদত ও রেয়াজতে অভ্যস্ত আর একজন অলি আল্লাহ্ ছিলেন ইরাকের পীরগণের মধ্যে প্রভূত সম্মানের অধিকারী। তাঁর নাম শায়েখ বক্কা বিন বতুর র.। কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করা ছিলো তাঁর কারামতসমূহের মধ্যে অন্যতম কারামত। তিনি মাঝে মাঝে বড়পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন।

বড়পীরের দরবারে এসে তিনি প্রথমে দরজা ঝাড়ু দিতেন। পানি ছিটিয়ে দিতেন। তারপর ইজাজত চাইতেন মোলাকাতের জন্য।

ইরাকের কিলুইয়া গ্রামের বিখ্যাত বুজর্গ ছিলেন শায়েখ আবু ছাইদ কিলুবী র.। তিনি ছিলেন মুফতী। কাশফ্ ও কারামতও ছিলো তাঁর। বড়পীরের সঙ্গে ছিলো তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা। তিনি মাঝে মাঝে বড়পীর সাহেবের খানকায় আসতেন। খানকার চৌকাঠ চুম্বন করতেন তিনি। তারপর প্রবেশ করতেন ভিতরে।

গাউসে আজম হজরত বড়পীরের প্রতি ভক্তি সম্মান অটুট রাখবার জন্য তিনি ইন্তেকালের সময় তাঁর পুত্র আবুল খায়ের ছাইদকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।

তৎকালীন অনেক খ্যাতনামা বুজর্গগণের ওস্তাদ বিশিষ্ট অলিআল্লাহ্ শায়েখ মত্বর আল বাজেরানী র.ও ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর সন্তানদেরকে এই বলে অসিয়ত করে ছিলেন যে, 'সে সময় সন্নিকটে যখন তরিকতের রাস্তায় আবুদল কাদের ছাড়া অন্য কাউকে অনুসরণ করার প্রশ্নই উঠবে না।'

প্রখ্যাত অলিআল্লাহ্ শায়েখ হায়াত বিন কায়েছ ছরানী, বড়পীরকে অভিহিত করতেন অলিআল্লাহ্গণের বাদশাহ্ বলে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, 'শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী র. এর দোয়ায় পশুর স্তনে দুধ আসে, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে এবং বিপদ মুসিবত দূর হয়ে যায়।'

বহু মাশায়েখগণের ওস্তাদ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুজর্গ শায়েখ আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন আলী র. মোহাক্কেকগণের অগ্রণী, সিদ্দীক, সালেহ এবং 'আলেমগণের ইমাম'বলে অভিহিত করতেন হজরত বড়পীরকে। তিনি আরও

বলতেন, 'বর্তমানে আকাশে একটি এবং জমিনে একটি সূর্য বিরাজমান। জমিনের সূর্য হচ্ছেন আবুদল কাদের জীলানী র.।'

বড়পীর র. এর একান্ত অনুগত ছিলেন বিখ্যাত বুজর্গ শায়েখ আবুল হাছান আলী বিন ইদ্রিছ ইয়াকুবী র.। তিনি বড়পীর সাহেবকে মোজাদ্দেদ এবং খাছ নায়েবে রাসূল স. বলে উল্লেখ করতেন।

শায়েখ মোকারেম বিন ইদ্রিছ আন্নহর খালেছি র. বড়পীর সাহেব সম্পর্কে বলতেন, তাঁর সমতুল্য কোনো বুজর্গ আমি কোথাও দেখিনি।

'বড়পীর সাহেব আবদাল এবং আকতাবগণের হাকিম।' একথা বলতেন শায়েখ খলিফা বিন মুসা নহর মূলকী র.।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে যাঁরা হজরত বড়পীর সাহেবকে যুগের ইমাম এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অলিশ্রেষ্ঠ বলে সসম্মানে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়েখ আহম্মদ বিন আবুল হাছান রেফায়ী, শায়েখ কদীবুল বান মোছেলী, শায়খ আবু নজিব আবদুল কাহের সোহরাওয়ার্দী, শায়েখ আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জিবায়ী, শায়েখ রাছলান দামেশকি, শায়েখ মুয়েদ ছনজারী, শায়েখ আমর ওসমান বিন মযরুকুল কারশী, শায়েখ আবু মোহাম্মদ আলকাছেম শায়েখ জাগীর আল কারদী, শায়েখ মাজেদ আল কারদী, শায়েখ আদী বিন মুছাফির উমুবী (রহমতুল্লাহি আলায়হিম আজমাঈন) প্রমুখ বিখ্যাত অলি বুজর্গবৃন্দ।

বড়পীর হজরত আবুদল কাদের জীলানী র. এর খলিফাগণও ছিলেন পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বড়পীরের নির্দেশে মানুষকে সুপথে আনবার জন্য তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। তাঁদের সমস্ত জীবন তাঁরা এই মহান কাজেই নিঃশেষিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হাদী, আলেম এবং আরেফে বিল্লাহ্। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অসংখ্য মানুষ মুক্ত হয়েছিলেন পথভ্রষ্টতার পঙ্কিলতা থেকে।

শায়েখ আছেম বিন নজিবুদ্দিন র. নামে একজন বুজর্গ বলেন, 'আমি দীর্ঘ দিন ধরে গাউসে আজমের খলিফাগণের সঙ্গে কাটিয়েছি। তাঁরা হৃদয়গ্রাহী ভাষায়

ওয়াজ নসিহত করেন। তাঁদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও স্পষ্ট। বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। তাঁরা কারো বিরুদ্ধে কখনোই কুৎসা প্রচার করতেন না।

বড়পীর সাহেবের খলিফাগণের জীবন যাপন প্রণালী ছিলো খুবই সাদাসিধা। তাঁরা তালিযুক্ত পোশাক পরতে লজ্জা পেতেন না। তাঁদের এলেম, তাকওয়া এবং স্বভাব বেশিষ্ট্য ছিলো অপরূপ। তাঁরা দরিদ্রের বন্ধু এবং বিপদগ্রস্তদের পরিচর্যাকারী ছিলেন। মানুষ তাঁদেরকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। তাঁরা বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত জনপদে শহরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বহুসংখ্যক প্রচারমুখী মাদ্রাসা।

তাঁদের কোরবানীর ফলে সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার নূর প্রবাহ ক্রমে ক্রমে তুস, বোস্তাম, তাবরীজ, হামাদান, মোছেল, কুফা, আল হাতীফ, হলব, দামেশক প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়লো।

খলিফাগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় খলিফা ছিলেন শায়েখ আবু নজীব সোহরাওয়ার্দী র.। অন্যান্যগণের মধ্যে ছিলেন শায়েখ আবু ছাইদ আহমদ বিন আবু বকর হারিমী আত্তার, শায়েখ আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম, শায়েখ আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খাশাব, ইমাম আবু ইছহাক ইব্রাহিম বিন আবদুল ওয়াহেদ মকদছী র. এবং আরো অনেক সুবিখ্যাত অলিআল্লাহ্।

হজরত বড়পীর সাহেব র. বলতেন–

'যদি তুমি আল্লাহ্র হুকুমের সামনে নফছের কামনা বাসনা নিশ্চিহ্ন করতে পারো এবং তাঁর ইচ্ছার নিকট করতে পারো আত্মসমর্পণ, তবেই তুমি লাভ করবে মারেফত অর্জনের যোগ্যতা।'

'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছুর প্রতি অনাসক্তি এবং বিমুখ থাকাই তাকওয়া ও পরহেজগারীর নিদর্শন।'

'প্রশ্নকারী না হয়ে তুমি জবাবদানকারী হও।'

'মানুষের বড় বন্ধুই তার প্রধান শত্রু।

'প্রথমে আখেরাতের সম্বল অর্জন করো। আর প্রতীক্ষা করো মৃত্যুর।'

'তুমি সবার কল্যাণকামী হবে– এই হচ্ছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা।'

'অসিয়তনামা বালিশের নীচে না রেখে কোনো মোমেনের জন্য শয়ন বাঞ্ছনীয় নয়।'

'তার জন্য আনন্দের অবকাশ কোথায়– মৃত্যুই যার পরিণতি।'

'আমিতো বিস্মিত হই তাদের সম্পর্কে– যারা আল্লাহ্পাক সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত– একথা জেনেও গোনাহ্র কাজে লিপ্ত থাকে।'

'দুনিয়া বিপদ আপদের সমষ্টি। অতএব সবর করো।'

'রহমত চেয়ো না। রহিমকে চাও।'

'মোমেন তাঁর পরিবার পরিজনকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করে। আর মোনাফেক তাঁর পরিবার পরিজনকে সোপর্দ করে ধন সম্পদের নিকট।'

'নফছ যেমন আল্লাহ্র কথা শোনে না, তুমিও তেমনি নফছের কথা শুনিও না।'

ঐ সমস্ত লোকের কার্যকলাপে আশ্চার্যান্বিত হই আমি, যারা অন্যের দোষানুসন্ধান করে, অথচ নিজের দোষ সম্পর্কে থাকে উদাসীন।'

'এই দুনিয়া তোমার মতো অনেককে প্রতিপালন করে পুষ্ট করেছে। অবশেষে নিজেই উদরস্থ করছে সবাইকে।'

'মানুষের নজরে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখো। সতর্ক না হলে নিজের দীনতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন তুমি মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন হবে।'

'যে ব্যক্তি দুনিয়া ধ্বংসশীল জেনেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়– তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।'

'লোকের চোখে বিনয়ীই বড় অহংকারী নয়।'

'দুনিয়াকে ভালোবাসাই যদি আমার একমাত্র গোনাহ্ হয়। তবুও আমি দোজখের উপযুক্ত হিসাবে সাব্যস্ত হবো।'

'অভাব ও রোগের সময় সবর করলে বিশেষ মর্যাদা লাভ হয়। আর বেসবর হলে লাভ হয় আজাব।'

'আল্লাহ্র প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে কোরো অত্যাচার ও পীড়নে দুঃখকষ্টকে বরণ করো। আরাম আয়েশ কমাও, রসূলে করিম স. এর জীবনাদর্শ এরকমই।'

'অর্থ উপার্জন করে হাতে রেখো। অর্থকে অন্তরে প্রবেশের অধিকার দিও না।'

'হাস্যকারীদের সঙ্গী হয়ো না। ক্রন্দনকারীদের সঙ্গী হও।'

'হালাল আহার করো। নেক আমলের ভিত্তি ইহাই।'

'যদি তুমি উচ্চ শব্দে 'আল্লাহ্'ও বলো তুবও ঐ উচ্চারণ তুমি বিশুদ্ধ নিয়তে উচ্চারণ করেছিলে, না মানুষকে শোনাবার জন্য উচ্চারণ করেছিলে, তা যাচাই করে দেখা হবে।'

'বাদশাহ্র দরবারে গমনকারীদের অন্তর কঠিন ও অহংকারী হয়ে পড়ে। বালকদের সাহচর্য হাসি তামাশায় লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। মহিলাদের সঙ্গে অধিক মেলামেশার কারণে আসে পদস্খলন এবং অসৎ স্বভাব। ফাসেকদের সঙ্গীগণ হয় নির্ভয়ে গোনাহ্র কাজ সম্পাদনকারী। তাদের তওবা করবার মনোবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। আলেমদের সাহচর্যকারীরা হয় জ্ঞানী ও আল্লাহ্ভিরু। নেককার লোকের সঙ্গে উঠা বসা করলে আল্লাহ্র আনুগত্যের শক্তি যায় বেড়ে।

'মানুষের মর্যাদা নষ্টকারীগণ আল্লাহ্র প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের দাবী করতে পারে না। আর নিজেকে শিক্ষা দিতে অপারগ ব্যক্তির পক্ষে অপরকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা অনুচিত।

'মানুষের নিন্দা বা প্রশংসার তোয়াক্কা না করাকেই এখলাছ বা অকৃত্রিমতা বলে।'

'যে দুনিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়েছে, সে আল্লাহ্‌কে রেখেছে পিছনে।'

'যে আখেরাতকে দুনিয়ার তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়, তাঁর জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই কল্যাণকর। আর দুনিয়াকে আখেরাতের মোকাবেলায় অগ্রাধিকার দানকারীদের জন্য উভয় স্থানই ক্ষতিকর।'

'সম্পদশালীদের সঙ্গে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে মেলামেশা করতে হয়। আর ফকিরের সামনে হতে হয় বিনয়ী ও নম্র।'

এ সমস্ত মুক্তার চেয়ে দামী বাণীসমূহ পড়লে মনের মধ্যে নেমে আসে যেনো বেহেশতের নূরানী প্রবাহ। আল্লাহ্‌র অলিগণের কথা কতোই না সুন্দর।

হজরত বড়পীর র. নিয়তিম যে ওয়াজের মজলিশের অনুষ্ঠান করতেন, সে সমস্ত অমূল্য ভাষণ লিপিবদ্ধ করা হতো সঙ্গে সঙ্গে। সে সমস্ত ভাষণের প্রতিটি বাক্যই তাঁর অন্তরের জ্যোতির্ময় ধারায় স্নাত। সে সমস্ত অমূল্য বক্তৃতা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়ে আসছে। 'ফতহুল গয়ব' এবং 'ফতহুর রব্বাণী' গ্রন্থদ্বয় ঐ সমস্ত অমূল্য বক্তৃতার সংকলন।

কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি নিজেও রচনা করে গিয়েছেন। 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত কবিতা সংকলনের নাম 'কাসিদায়ে গাওসিয়া।' মহব্বতের সীমাহীন প্রাবল্য সহকারে তিনি রচনা করেছেন কাসিদাগুলি।

কাসিদাগুলি যেনো প্রেমের এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অথৈ সমুদ্র। কাসিদায় তিনি বলেছেন—

'আল্লাহ্‌র মহব্বত আমি পান করেছি মিলনের পেয়ালায়। সেই প্রেমের পেয়ালা আমি আরো চাই। আরো চাই।'

'সেই প্রেমের তরঙ্গ আমার দিকে ছুটে আসে। ছুটে আসে। সেই প্রেমের মহিমায় ধন্য আমি! আমি ধন্য।'

'আমি দুনিয়ার সব কুতুব ও আউলিয়াদেরকে বলেছি, আমার মর্যাদার নিকট নত হও তোমরা। আমার সিলসিলায় দাখেল হও তোমরা। তোমরা তো আমার মুরিদের মতো।'

'আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মঞ্জিলে আমি শুধু একা। তিনি আমার প্রভু, আমার উপরে একমাত্র তাঁরই শক্তি প্রযোজ্য। সেই আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট।'

'মারেফতের আসমানে নক্ষত্রের মতো দীপ্তমান আমি। সকল শায়েখ আমার কর্তৃত্বাধীনে। কে এমন অলি, যে লাভ করেছে আমার মতো উচ্চতা?'

'আল্লাহ্‌পাক আমাকে আবরিত করেছেন মর্যাদা ও উচ্চ সাহসিকতার পরিচ্ছদে। আমার মস্তক তিনি শোভিত করেছেন পূর্ণতার মুকুটে।'

'যদি আমার ইশকের সহস্য আমি ঢেলে দেই দরিয়ায়, তবে শুকিয়ে যাবে সে সমুদ্র।'

'যদি পর্বতের প্রতি নিক্ষেপ করি সেই রহস্য, তবে পর্বতও হয়ে যাবে চূর্ণ বিচূর্ণ।'

'যদি সে প্রেমের নিগুঢ় তত্ত্ব বলি অনলের কাছে, তবে নিভে যাবে সে অনলের শিখা।'

'যদি সে প্রেমের গোপন তথ্য নিক্ষেপ করি মৃত ব্যক্তির উপর, তবে মৃতও পেয়ে যাবে নতুন জীবন।'

'সে ব্যক্তি কেনো আমার সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়? সে তো জানে না সময়ের বিবর্তন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।'

'আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে আমার খ্যাতির ডঙ্কা বাজছে। আমার সামনে চলছে সম্মানের ঘোষক।'

'প্রত্যেক অলিরই এক একটি তরিকা আছে। আমার তরিকা শুধু রসুলুল্লাহ স. এর অনুসরণ, যিনি কামালিয়াতের সূর্য সদৃশ।'

'আমি সৈয়দ বংশদ্ভূত। ইমাম হাছানের আওলাদ আমি। এই মর্যাদার কারণে সমস্ত আউলিয়ার স্কন্ধে আমার কদম।'

কাসিদায়ে গাউসিয়ার উপরোক্ত অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যায়– কীরকম প্রবল আধ্যাত্মিক অবস্থার মত্ততায় হজরত বড় পীর র. রচনা করেছিলেন কাসিদাগুলি। ভক্তবৃন্দ কেউ কেউ ভক্তিভরে নিয়মিত পাঠ করে থাকেন কাসিদায়ে গাউসিয়া।

তরিকার পথে পীরের (শায়েখের) দায়িত্ব খুবই কঠিন। বড় পীর র. পীরের দায়িত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন– তার পালন করবার মতো ক'জন আছেন পৃথিবীতে?

তিনি বলেছেন, 'কেউ মুরিদ হতে চাইলে নিজের জন্য নয়, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাকে মুরিদ করানো পীরের কর্তব্য। পীর মুরিদকে নসিহত করবেন। প্রদর্শন করবেন তাঁর প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ততার দৃষ্টি। মুরিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার হবে নম্র। মুরিদের পক্ষে কোনো কাজ কঠিন হলে তার সহজ পন্থা বলে দিতে হবে পীরকে। মুরিদের প্রতি পীরের আচরণ হবে স্নেহময় জনক জননীর মতো।'

মুরিদের দ্বারা কোনোপ্রকার সুযোগসুবিধা গ্রহণ করা পীরের জন্য বৈধ নয়। মুরিদের সম্পদ এবং শ্রম গ্রহণ করা পীরের পক্ষে অনুচিত। তবে- এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে কোনো বিশেষ ইশারা হলে এরকম করা বৈধ হতে পারে।

মুরিদকে এছলাহ (সংশোধন) করবার জন্য পীর আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সুতরাং মুরিদকে শিক্ষা দেওয়ার কাজ যেনো পীরের জন্য কষ্টকর ও ভীতিপ্রদ না হয়। আল্লাহ্পাকের রহমতের উপরে ভরসা করে সাহসিকতার সঙ্গে মুরিদকে শিক্ষাপ্রদান করতে হবে। মুরিদ অপরাধ করলে পীর মুরিদের পক্ষ থেকে তওবা করবেন।

মুরিদের দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত হলে পীর তাঁকে একান্তে সতর্ক করে দিবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হতে বলবেন। বিশ্বাস ও আমলের ক্রটিবিচ্যুতির ব্যাপারে এবং এই বিষয়ে অশোভন উক্তি উচ্চারণের ব্যাপারে মুরিদকে সতর্ক করে দেওয়া পীরের কর্তব্যকর্ম।

পীর যদি নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ না হন, তবে তিনি বেলায়েতের বৃত্ত থেকে অবশ্যই বিচ্যুত হয়ে পড়বেন। এ অবস্থায় তাঁর আত্মসংশোধনে নিয়োজিত হওয়া উচিত।

প্রকৃতপক্ষে বেলায়েতের পদমর্যাদার জন্য বহু দুর্লভ গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন। প্রকৃত অলিআল্লাহ্গণ সৎস্বভাবসমূহের জীবন্ত নিদর্শন।

হজরত বড়পীর বলেছেন, ‘যার মধ্যে বারোটি সৎস্বভাব না থাকবে, সে কখনো বেলায়েতের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারবে না। এর মধ্যে দুটি আদত তাকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্র আদত থেকে। আদত দুটি হলো– অপরের দোষক্রটি গোপন রাখা এবং মেহেরবান হওয়া। দুটি স্বভাব বিশেষভাবে গ্রহণ করতে হবে রসূলেপাক স. এর নিকট হতে। সে দুটি স্বভাব হচ্ছে– দয়া ও সহানুভূতি। দুটি গুণ অর্জন করতে হবে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর কাছ থেকে। সে দুটি হলো– ভালোবাসা এবং সত্যবাদিতা। দুটি অভ্যাস গ্রহণ করতে হবে হজরত ওমর ফারুক রা. এর চরিত্র থেকে। সেগুলো হচ্ছে– সৎপথে আহবান জানানো এবং মন্দ পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। হজরত ওছমান রা. এর নিকট থেকে নিঃসম্বলকে সাহায্য দান এবং রাত জেগে ইবাদত করবার অভ্যাস গ্রহণ করতে হবে এবং বাকী দুটো অভ্যাস গ্রহণ করতে হবে হজরত আলী রা. এর আদর্শ থেকে। সে দুটো হলো– আলেম হওয়া এবং বীরত্ব প্রদর্শন করা।’

প্রত্যেক মুসলমানকে যে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখতে হয়, হজরত বড়পীর র. তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

প্রথমতঃ সমস্ত লাভ লোকসান আল্লাহ্পাকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংঘটিত হয়। সৃষ্টির প্রথম দিনে আল্লাহ্পাক যার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা অবশ্যই সম্পাদিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ আল্লাহ্র অনুগত দাস। আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই করেন। মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের সীমা নেই। আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে যাই কিছু ঘটুক না কেনো, তাতে অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত। বরং রাজী থাকা উচিত সব ব্যাপারে।

তৃতীয়তঃ এই পৃথিবী ধ্বংসশীল একথা মনে রাখতে হবে। অচিরেই এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আখেরাত সন্নিকটে। মুসাফিরি হালে কিছুদিন এই দুনিয়ায় অতিবাহিত করতে হবে। সফর শেষে প্রত্যেককেই পৌঁছাতে হবে আসল আবাসে। সুতরাং অল্প দিনের এই সফরের ক্লেশ স্বীকার করে আসল আবাস আবাদ করবার কাজে লিপ্ত থাকা সকলের কর্তব্য, যাতে চিরস্থায়ী জীবনে সুখ শান্তি লাভ করা যায়। বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য সূচী এই।'

হজরত বড়পীর র. এর মাধ্যমে প্রকাশিত কারামতসমূহ পৃথিবী প্রসিদ্ধ। এতো বেশী কারামত তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে যে– তা শুমার করা মুস্কিল।

সাধারণতঃ সব আউলিয়াগণের মাধ্যমেই অল্পবিস্তর কারামত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তবে হজরত বড়পীর র. এর মতো এতো বেশী কারামত অন্য কোনো অলির মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি বলেই সবাই মনে করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক কার্যকলাপ আল্লাহ্‌পাক তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর প্রিয় বান্দাগণের মাধ্যমে জাহের করে থাকেন। যখন এই সমস্ত অলৌকিক কার্যকলাপ নবী আ. এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর নাম হয় মোজেজা। আর যখন অলিগণের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়, তখন তার নাম হয় কারামত। মোজেজার উপরে যেমন ইমান আনতে হয়, তেমনি বিশ্বাস করতে হয় কারামতকেও। কিন্তু নবী আ.গণের জন্য যেমন মোজেজা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য, অলিগণের জন্য তেমন অবশ্য কর্তব্য নয়।

এতদ্ব্যতীত কাফের মোনাফেকদের দ্বারাও অলৌকিক কার্যকলাপ সংঘটিত হতে পারে। এই ধরনের কার্যকলাপকে এস্তেদরাজ (ভেল্কীবাজী বা যাদু) বলে। এস্তে দরাজ এবং এস্তেদরাজ প্রদর্শনকারীকে অস্বীকার করতে হবে। কারণ, সে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসুলকে।

কেয়ামতের পূর্বে দাজ্জালও বহু এস্তেদরাজ প্রদর্শন করবে। কিন্তু সে হবে কাফের বা অবিশ্বাসী। সে যেমন আল্লাহ্‌র দুশমন তেমনি তাকে স্বীকারকারীরাও হবে আল্লাহ্‌র শত্রু।

মোট কথা, অলৌকিক কার্যকলাপ কার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে তা দেখতে হবে এবং তার পরেই বিচার করে দেখতে হবে প্রকাশিত কার্যকলাপসমূহ বিশ্বাস করতে হবে, না অস্বীকার করতে হবে।

কোনো ঘটনাকে অতিরঞ্জিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া অধিকাংশ মানুষের এক স্বভাবজাত দুর্বলতা। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ মহামানবগণকে মানব বলে মনে করতে অভ্যস্ত নয়। অতি ভক্তির কারণে অনেক মানুষই তাদের নিজেদের ধারণায় মহামানবগণকে প্রদান করে এক বিকৃত অবয়ব। আবার কিছু সংখ্যক মানুষ বিপরীত দিকে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। তারা তাদের নিজেদের মতো সবাইকে প্রবৃত্তি আক্রান্ত মনে করে এবং মহামানবদেরকে করে বসে অস্বীকার। উভয় দলই সীমালংঘনকারী। তারা মধ্যবর্তী অবস্থার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। আর এই মধ্যবর্তী অবস্থার নামই সিরাত্বল মোস্তাকিম বা সোজা পথ। যে পথের ডানও নেই বামও নেই। যে পথে ঘাটতি বাড়তি উভয় অবস্থাই সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। যে পথের নেই কোনো বিকল্প সে পথই তো সোজা পথ।

প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। একটা ভারসাম্যমূলক অবস্থা আছে। এই ভারসাম্যসম্পন্ন মানসিকতা অনেকেরই থাকে না। আর থাকে না বলেই মাপের সীমানা পেরিয়ে কেউ গমন করে ঊর্ধ্বে কেউ নিম্নে। কেই বামে কেউ দক্ষিণে। সেই কারণেই দেখা যায় হজরত ইসা আ.কে একদল ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র পুত্র বানিয়ে দিয়েছে। আর একদল তাঁর এবং তাঁর পবিত্রা মায়ের নামে দিয়েছে অপবাদ। তাই দেখা যায়, আমিরুল মোমেনীন হজরত আলী রা.কে অতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে একদল হয়েছে শিয়া আর একদল তাঁকে ঘৃণা করে হয়েছে খারেজী। উভয় দলই বিভ্রান্তির বিপর্যস্ততায় নিমজ্জিত।

অলিগণের বেলায়েতের ক্ষেত্রে চলেছে ঐরূপ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। বড় পীর র. সম্পর্কেও হয়েছে এরকমই। একদল তাঁর কারামতসমূহের প্রতি এতো দুর্বল যে, নিজেদের অজান্তেই তারা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়েছে তাঁর কারামতসমূহকে। আর একদল তাঁকে অলিআল্লাহ্ বলে স্বীকারই করতে চায় না। এই অস্বীকারকারী সম্প্রদায় হচ্ছে ওহাবী সম্প্রদায়। অবশ্য এই বদনসিব সম্প্রদায়টি দুনিয়ার সমস্ত অলিগণের প্রতি খারাপ ধারণা রাখে। তারা তাদের প্রবৃত্তির প্রভাবে এতোবেশী দৃষ্টিহীন যে, হাদিসে কুদসীর বাণীতে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'যে আমার অলিগণের বিরুদ্ধে অসৎ ভাব অন্তরে পোষণ করে, সে যেনো আমার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।'

হজরতের সমসাময়িক কালে আল্লামা ইবনে জওজী ছিলেন হজরত বড়পীর র. এর সমালোচক ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। বহু বিষয়েই তিনি হজরতের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতেন। শোনা যায়, অসামান্য জ্ঞানতাপস এই প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনে জওজী পরবর্তী সময়ে নিজের ভুল বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন হজরতের নিকট।

অধিকাংশ বুজর্গ এবং আলেমবৃন্দ সসম্মানে সে জামানার শ্রেষ্ঠ অলি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন হজরত বড়পীর সাহেবকে। বস্তুতপক্ষে 'সকল অলির গর্দানে আমার কদম' হজরতের এই উক্তি তাঁর সময়ের জন্য সঠিক উক্তিই ছিলো। কিন্তু এই উক্তির লক্ষ্য ছিলেন তাঁর সময়ের জীবিত অলিগণ। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অলিগণ নন। কারণ, পূববর্তীদের মধ্যে রয়েছেন রসূলেপাক স. এর সম্মানিত সাহাবাবৃন্দ রা. যাঁদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী সাহাবী শুধু বড়পীর র. নন বরং সমস্ত অলিগণ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আবার হজরত বড়পীর র. এর পরবর্তীগণের মধ্যেও রয়েছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.। হজরত ইমাম মেহেদী র.। তাঁরাও হজরত বড়পীর র. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যাহোক, হজরত বড়পীর র. জন্মগতভাবে অলিআল্লাহ্ ছিলেন। তাই দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়েও তিনি রমজান মাসের রোজা রেখেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে কারামত। দূর্ধর্ষ কাজাক ডাকাত সর্দারের তার দলবলসহ হজরতের নিকট তওবা করাটাও ছিলো কারামত। যে কঠিন সাধনায় লিপ্ত হয়ে তিনি সফলতার শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাও ছিলো কারামতের মতো। সাধারণ মানুষের পক্ষে ওরকম কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব।

পরবর্তী সময়ে তিনি যখন গাউসুল আজম পদমর্যাদায় ভূষিত হয়ে মানুষের হেদায়েতের জন্য বাবুল আজাজ মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে তাঁর জ্যোতির্ময় ভাষণ রাখতে শুরু করেন, তখন তাঁর সমস্ত কিছুই যেনো কারামতে পর্যবসিত হয়ে যায়। তাঁর বক্তব্য চুম্বকের মতো মানুষকে আকর্ষণ করতো। বহু দূর দূরান্ত থেকে শোনা যেতো তাঁর বক্তব্য। যাঁরা ছিলেন সে জামানার এলেম ও মারেফতের দিকপাল, তাঁরাও সাধারণ শ্রোতার মতো নতজানু হয়ে বসে যেতেন হজরতের দরবারে।

বিখ্যাত বুজর্গ শায়েখ আফিফউদ্দিন বলেছেন, 'আমি একদিন গাউসে আজমের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ হজরত বড় পীর সাহেবের কারামত দেখবার ইচ্ছে আমার মনে জাগলো। এরকম মনে হতেই হজরত গাউসে আজম আমার দিকে তাকালেন এবং মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, আফিফ। একটু পরেই আমার

পাঁচজন মেহমান এসে পৌঁছাবে। তাদের মধ্যে একজন অনারব। তার শরীরের বর্ণ শাদা। তার ডান গালে একটি কাটা দাগ আছে। নয় মাস পরে এক জঙ্গল অতিক্রমের সময় একটি বাঘ তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে। দ্বিতীয় মেহমান ইরাকী। সেও ফর্সা দেখতে। তার এক চোখ নষ্ট হয়েছে। তার এক পা খোঁড়া। সে ব্যক্তি আমার কাছে এক মাস থাকবে। তারপর শেষ হয়ে যাবে তার হায়াত। তৃতীয় ব্যক্তি একজন মিসরীয়। তার গায়ের রং তাম্রবর্ণের। তার বাম হাতে ছয়টি আঙ্গুল রয়েছে। তার বাম কানে আছে বর্শাঘাতের ক্ষতচিহ্ন। আঘাতটি লেগেছিলো তিরিশ বছর আগে। চতুর্থ মেহমানটি শাম দেশের অধিবাসী। সে শ্যামলা দেখতে। তার মৃত্যু হবে সাত বছর পর। পঞ্চম ব্যক্তিটি ইয়ামানের বাসিন্দা। সে গৌরবর্ণের। সে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তার পরিচ্ছদের নীচে রয়েছে ক্রুশ। ইমানদার বান্দাগণকে পরীক্ষা করা তার স্বভাব।'

হজরত বড় পীর র. পুনরায় বললেন, 'আজমী ব্যক্তি ভূনা গোশত খেতে ভালোবাসে। ইরাকী ভালোবাসে মুরগীর গোশ্ত ও ভাত। মিসরীয় পছন্দ করে মধু। পুরি পছন্দ শাম দেশের লোকটির আর ইয়ামানী চায় ভাজা ডিম। আল্লাহ্পাক তাদের রিজিক এখানে পৌঁছে দিবেন।'

আফিফউদ্দিন একটু পরেই সবিস্ময়ে দেখলেন, বড়পীর র. যেরকম বলেছিলেন, অবিকল ঐ রকম দেখতে পাঁচজন আগন্তুক হাজির হলেন খানকায়। তারা হজরতের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। একটু পরেই খাদেম এসে বললেন, 'মেহমানদের খানা প্রস্তুত।'

মেহমানগণ খেতে বসলে শায়েখ আফিফউদ্দিন অবাক হয়ে দেখলেন, মেহমানগণের সামনে তাঁদের প্রত্যেকের পছন্দ মতো খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। মেহমানরা ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেলো সবাই।

আহারের পর ইয়ামানী ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করে হজরত বললেন, 'হে মেহমান। তুমিতো খৃষ্টান। তোমার সঙ্গে ক্রুশ রয়েছে।'

ইয়ামানী ব্যক্তিটি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তখনই তিনি হজরতের নিকট তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

শায়েখ আফিফউদ্দিন বলেন, 'মেহমানগণের হায়াত সম্পর্কে হজরত যে রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে অবিকল তাই-ই ঘটেছিলো।'

আর একবারের ঘটনা। শায়েখ আফিফউদ্দিন গাউসে আজমের মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে সময় হজরত গাউসে আজম একটা লাঠি হাতে হাজির হলেন। শায়েখ মনে মনে ধারণা করলেন, ঐ লাঠির মাধ্যমে হজরত যদি কোনো কারামত প্রদর্শন করতেন। এরকম কথা মনে উদয় হতেই হজরত শায়েখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মৃদু মৃদু। তারপর তাঁর হাতের লাঠিখানা তিনি মাটিতে পুঁতে

ফেললেন। হঠাৎ সে লাঠিখানা জ্যোতির্ময় হয়ে গেলো। সে জ্যোতির ছটায় আলোকিত হয়ে উঠলো চারিদিক। বহুক্ষণ এ অবস্থা প্রদর্শনের পর হজরত লাঠিখানি মাটি থেকে তুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির জ্যোতি উধাও হয়ে গেলো। হজরত তখন শায়েখকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি কি এরকম চাওনি?' শায়েখ বললেন, হ্যাঁ।'

দজলা নদীতে বান ডাকলো একবার। বানের পানিতে ছাপিয়ে উঠলো দজলার দু'কুল। শহরে প্রবেশ করলো বানের পানি। শহরবাসী ভীত হয়ে পড়লো খুব। সবাই এসে দোয়ার জন্য ভীড় করে দাঁড়ালেন হজরতের দরবারে। হজরত লোকজনকে নিয়ে দজলার তীরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর যে স্তরে স্বাভাবিক প্রবাহ থাকে দজলার, সেখানে একটা লাঠি পুঁতে দিতে বললেন তিনি। তাই করা হলো। সাথে সাথে পানি কমে গেলো। দজলা ধারণ করলো তার স্বাভাবিক রূপ।

একবার শায়েখ আবুল গানায়েম এবং শায়েখ আলি বিন হাশেম হজরতের দরবারে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন, বাইরের দেউড়িতে এক যুবক অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সে শায়খদ্বয়কে অনুরোধ করলো, 'আপনারা হজরতের দরবারে আমার জন্য দয়া করে একটু সুপারিশ করবেন। আমি বেয়াদবি করেছিলাম বলে শাস্তি পাচ্ছি খুব।'

শায়েখদ্বয় দরবারের অভ্যন্তরে গিয়ে হজরতের নিকট বিপদগ্রস্ত যুবকটিকে মাফ করে দিবার জন্য হজরতের নিকট সুপারিশ জানালেন। হজরতের মন নরোম হলো। তিনি মাফ করে দিলেন যুবকের অপরাধ। এই সংবাদ যুবকের কাছে পৌঁছাতেই সে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেলো আকাশে। শায়েখদ্বয় চোখের সামনে এরকম আশ্চর্য ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তারা হজরত বড় পীর র. এর নিকট ঘটনা খুলে বললে হজরত বললেন, 'ঐ যুবকটি অদৃশ্যলোকের বাসিন্দা। বাগদাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো সে। আর মনে মনে ভাবছিলো এই শহরে তার সমতুল্য আর কেউ নেই। আমি তার মনোভাব জানতে পেরে বুজর্গী কেড়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে। তার জন্য সুপারিশ করা না হলে, সে মাথা কুটতে কুটতে মারা পড়তো।'

ওয়াজের মজলিশ চলছিলো একদিন। অসংখ্য লোকের সামনে বক্তৃতা করছেন হজরত। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। শুরু হলো বর্ষণ। হজরত আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ্। আমি তো তোমার উদ্দেশ্যেই লোকজনদেরকে সমবেত করেছি। আর তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছো। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো। ওয়াজের মজলিশের বাইরে বৃষ্টি হতে লাগলো শুধু।

একবার ইরানী সৈন্যরা বাগদাদ আক্রমণ করে বসলো। খলিফা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না। ভীত হলেন তিনি। তিনি তখন শরণাপন্ন হলেন গাউসে আজমের। হজরত গাউসে পাক তখন বিখ্যাত বুজর্গ আলী বিন আল হাইতিকে বললেন, 'আপনি ইরানী সৈন্যদলের মধ্যে যান। সেখানে একটি চাদর নির্মিত তাঁবু দেখতে পাবেন। তাঁবুতে থাকবে তিনজন লোক। আপনি তাদেরকে ফিরে যেতে বলবেন। যদি তারা বলে 'আমরা নির্দেশপ্রাপ্ত' তখন আপনি বলবেন, 'আমিও নির্দেশপ্রাপ্ত।'

হজরতের নির্দেশ মোতাবেক আলী বিন আল হাইতি ইরানী সৈন্য দলের অভ্যন্তরে এক জায়গায় গিয়ে চাদর নির্মিত একটি তাঁবুতে তিনজন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, 'আপনারা চলে যান।' তখন তাঁরা বললেন, 'আমরা নির্দেশপ্রাপ্ত'। আলী হাইতি বললেন, 'আমিও নির্দেশ পেয়েই এসেছি এবং নির্দেশ অনুযায়ী চলে যেতে বলছি আপনাদেরকে।' একথা শোনার সাথে সাথে লোক তিনটি উঠে দাঁড়ালেন এবং ফিরে চলে গেলেন যুদ্ধের ময়দান থেকে। তাঁদের চলে যাবার পর থেকেই ইরানী বাহিনীর মধ্যে শুরু হলো চরম বিশৃঙ্খলা। এরপর পালিয়ে গেলো সবাই দলে দলে।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

অস্তাচলের আহবান এবার। যে আহবানের প্রতীক্ষায় আজীবন জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হন বিরহী আশেকগণ সেই প্রতিক্ষীত আহবান সমুপস্থিত। কাজ শেষ। অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদিত হয়েছে যথাযথভাবে। হিজরী ৫১২ থেকে হিজরী ৫৬১ পর্যন্ত হেদায়েতের যে তেজদীপ্ত দিবাকর বাগদাদের আকাশ থেকে কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে, আজ তার অস্তাচলের ডাক এসেছে। মাশুক মিলনের অপার্থিব সুরলহরী ভেসে আসছে দূর অজানা থেকে। সে অনির্বচনীয় সঙ্গীতের রনন অন্তর উতলা করেছে হজরত বড়পীর র. এর।

দেখতে দেখতে রবিউস সানি মাস এসে গেলো, অসুস্থ হয়ে পড়লেন হজরত। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। বুঝতে পারলেন, অন্তিম সময় সমুপস্থিত। দীর্ঘ বিরহযন্ত্রণার যবনিকাপাত হবে এবার। মাশুক মিলনের সময় সমাগত।

সবাই বুঝলেন, হজরত প্রস্তুতি নিচ্ছেন পরযাত্রার জন্য। সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজন, মোর্শেদ অন্তঃপ্রাণ মুরিদবৃন্দ সবাই বিচলিত হয়ে উঠলেন। আসন্ন শোকের বিষণ্নতায় মুহ্যমান হলেন সবাই। কি উপায় আর? প্রতীক্ষা। শুধু নিরুপায় প্রতীক্ষা। যাবার সময় হলে চলে যায় সবাই। আল্লাহ্‌পাকের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্পণ ব্যতীত এখন সব পথ অবরুদ্ধ।

হজরতের পুত্র সৈয়দ আবদুল ওয়াহাব শোকার্ত কণ্ঠে পিতার নিকট চাইলেন শেষ উপদেশ। বললেন, 'হজরত। আপনার অবর্তমানে কিভাবে চলবো আমরা বলে দিন।'

হজরত অসিয়ত করলেন, 'আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত রাখবে অন্তরে। আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে ভয় করো না। আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করো না। নির্ভরও করো না আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো উপর। তোমার যা প্রয়োজন তা তাঁরই কাছে চেয়ো। সেই চিরস্থায়ী জাত আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহিদই তৌহিদ। তাঁর তৌহিদকেই আঁকড়ে থেকো সব সময়।'

আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে যখন অন্তর স্থিতাবস্থা ধারণ করে, তখন তাতে আর ঘাটতি থাকে না কিছুই। তখন কিছুই স্খলিত হয় না হৃদয় থেকে। আমি হচ্ছি এমন মগজ, যা হয়েছে পূর্ণরূপে উন্মোচিত।'

রবিউস্‌ সানি মাসের এক একটি দিন, এক একটি রাত পালাক্রমে নিয়ে আসে বাগদাদবাসীদের অন্তরে তাজা বিরহের যন্ত্রণা। অধিকতর যন্ত্রণা। মুক নির্বাক সবাই। মৌন দর্শকের মতো সবাই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন অস্তাচলগামী এই সূর্যের দিকে। মহাসাধকের অন্তিম সময়গুলো কতোই না জ্যোতির্ময়। কোন অপার্থিব জগত থেকে অবোধ্য কতো শত ভাবোন্মাদনা এসে এক এক সময় এক এক রহস্যে রাঙিয়ে দিচ্ছে মহাপ্রেমিক বড়পীর র. এর মুখাবয়বকে। সবাই শুধু দেখেন। দুর্বোধ্য দৃশ্যসমূহের মুহুর্মুহু পট পরিবর্তনের মধ্যে বিক্ষত বুকে সবাই উল্টিয়ে যান পরমায়ুর পাতা। যার এক পৃষ্ঠা শাদা। এক পৃষ্ঠা কালো। এক পৃষ্ঠা দিন। এক পৃষ্ঠা রাত।

রবিউ্‌ সানির চন্দ্র ভরাট হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। দেখতে দেখতে এসে পড়লো এগারই রবিউস্‌ সানি। ৫৬১ হিজরীর **১১**ই রবিউস্‌ সানি। এই দিনই নির্ধারিত হলো হজরতের মাশুক মিলনের দিন।

হজরত ঘোষণা করলেন, 'সরে যাও সবাই আমার কাছ থেকে। আমি তো এখন তোমাদের সঙ্গে নই। আমার কাছে অনেকে হাজির হয়েছেন এখন। এখানে

বসেছে দোয়ার বিশাল মজলিশ। মজলিশের মেহমানদের জন্য স্থান ছেড়ে দাও। তাঁদেরকে সম্মান প্রদর্শন করো। স্থান সংকীর্ণ করো না মেহমানদের।

আমার ও তোমাদের মধ্যে এখন আসমান জমিনের মতো ব্যবধান। আমি তোমাদের তুল্য নই। তোমরাও তোমাদেরকে আমার সঙ্গে তুলনীয় মনে করো না।'

হজরতের পুত্র সৈয়দ আবদুল আজিজ প্রশ্ন করলেন, 'হজরত। রোগযন্ত্রণা এখন কেমন?'

হজরত বড় পীর র. বললেন, প্রশ্ন করো না আমাকে। আল্লাহ্পাকের জ্ঞানে এখন আমার আধ্যাত্মিক অবস্থান্তর ঘটছে। আমার রোগের পরিচিতি কেউ জানে না। জ্বীন, ফেরেশতা, মানুষ-কেউ জানে না। কেউ না।'

'আল্লাহ্পাকের আদেশের দ্বারা তাঁর জ্ঞান পরিবর্তিত হয় না। আদেশের পরিবর্তন হয়। কিন্তু জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। তকদীরের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্পাকের আওতাধীন। তাঁর কৃতকর্মের প্রতি প্রশ্ন তুলবার অধিকার কারো নেই। বরং বান্দাগণকেই তাদের নিজেদের কৃতকর্মের বিষয়ে আল্লাহ্পাকের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ...গুণাবলীর বিবরণ যেমন আসে তেমনি চলেও যায়। স্থির থাকে শুধু অস্তিত্ব।'

হজরতের পুত্র সৈয়দ আবদুল জব্বার জানতে চাইলেন তবুও, 'হজরত। আপনার শরীরের কোথাও কি কোনো যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে?'

হজরত বড় পীর র. বললেন, 'আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্রণাদগ্ধ। কিন্তু হৃদয় শান্ত।'

এরপর থেকেই অজ্ঞাতলোকের অচেনা সব ভাবের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকলেন হজরত বড়পীর। অদৃশ্য আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে তিনি বার বার বলতে লাগলেন, 'আপনাদের প্রতিও বর্ষিত হোক আল্লাহ্পাকের শান্তি, দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহ্পাক আমাকে, আপনাদেরকে, সবাইকে ক্ষমা করুন।'

জীলান সূর্যের হাতছানি

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

ISBN 984-70240-0031-6